অভিনয় শিল্প



ইন্‌স্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্
কলকাতা

প্রকাশক ঃ
সঞ্জীব চক্রবর্তী
ইন্‌স্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্

মুদ্রক ঃ
কল্যাণ সরকার
ও
অঞ্জন শঙ্কর সেনগুপ্ত
এ. পি. এণ্টারপ্রাইজেস
১৩৬, ঝাউতলা রোড
কলকাতা ৭০০০১৭

প্রচ্ছদ ঃ
অরুণ বণিক

রেখাচিত্র ঃ
সুশান্ত চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭
৮ই মে ১৯৬০

উৎসর্গ

শ্রী শঙ্কর সেন

ও

শ্রীমতী আরতি সেন

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

শ্রী অনুজন্ দাশগুপ্ত রচিত "অভিনয় শিল্প— সংলাপ ও কণ্ঠস্বর" পড়লাম। আমাদের দেশে থিয়েটারের চর্চা আছে একথা যেমন সত্যি, থিয়েটারকে সাহায্য করার জন্যে ভালোজাতের বই নেই একথা সমান সত্যি। শ্রী দাশগুপ্তের আলোচ্য বইখানি সে অভাব অনেকটা পূরণ করবে। যাঁরা থিয়েটারের চর্চা করেন, তাঁদের পক্ষে এ বই অবশ্যপাঠ্য।

শ্রী দাশগুপ্ত নাট্যচর্চা করছেন বহুদিন থেকেই, বহুভাবে এবং বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাঁর কথাগুলি কেবল পুঁথিগত নয়, অবশ্যই অভিজ্ঞতালব্ধ—এ বিষয়টি যে কোনো মনস্ক পাঠকের কাছেই সহজে প্রতিভাত হবে। এরকম একখানা বইয়ের দরকার ছিলো।

বিষয়সূচী এখানে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আগে দেশী ও বিদেশী বিখ্যাত শিল্পী ও বোদ্ধাদের উদ্ধৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী দাশগুপ্ত বইটি লিখতে বেশ যত্ন নিয়েছেন। আমার থিয়েটার-চর্চার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এদেশে তাঁর প্রয়াস যথার্থ সম্মানলাভ করবে।

উচ্চারণ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ আছে। সেটি অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের বিবিধবঙ্গীয় উচ্চারণে এটি পকেট-ব্যাকরণ বিশেষ। এইরকম একটা লেখা মনে হয় আমাদের বহুলালিত কল্পনার আকাশে আচমকা ছাড়া পেয়ে অবাক করে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। এ বইয়ের সবই সুন্দর। দরকারী এবং সুন্দর।

আরেকটা কারণে লেখককে ধন্যবাদ জানাব। নবনাট্য চর্চার কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা এ দেশের প্রাচীন নাটক পড়েও না জানেও না। উদ্ধৃতিগুলিতে শ্রী দাশগুপ্ত প্রাচীন নাটকের সংলাপ ব্যবহার করেছেন বহুলাংশে। চর্চা করতে করতেও ছেলেমেয়েদের মন প্রাচীন নাটকগুলির দিকে খানিকটা ফিরলেও বহু লাভ।

আমরা সাধারণতঃ অনুশীলন-বিমুখ। দীর্ঘদিন কষ্ট করা, চেষ্টা করা আমাদের স্বভাবে নেই। যাঁদের আছে সাফল্য তাঁদের কাছে অবনতি স্বীকার করে একথা জেনেও, আমরা অনেকে জানিনা চেষ্টা কোন্ পথে করতে হবে, কতোটা এবং কেমন করে। এ বইয়ে তার উত্তর আছে। সে উত্তর ভাসা-ভাসা নয়, আবছা নয়, অস্পষ্ট নয়। বেশ দৃপ্ত, সোজা এবং স্পষ্ট। কষ্টসাধ্য কিন্তু ছল নয়। এটাই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে।

আমি এই বইটির বহুল প্রচার এবং সাহায্যদানের প্রসারতা কামনা করি। শ্রী দাসগুপ্তকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বই প্রসঙ্গে

নাট্যশিল্পের মহতী উদ্দেশ্যে সমর্পিত পেশাদার, অপেশাদার ও গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেতা, পরিচালক ও কলাকুশলী-বৃন্দ ; শিক্ষাব্রতী, সমালোচক ও গবেষক ; বিশ্ববিদ্যালয় ও নাট্যশিক্ষায়তনের অধ্যাপক, প্রশিক্ষক ও ছাত্রবন্ধুরা বাংলা ভাষায় লিখিত, সহজবোধ্য অথচ তথ্যপূর্ণ ও ব্যবহারিকজ্ঞানসমৃদ্ধ নাট্যবিষয়ক বই-এর প্রয়োজন অনুভব করে আসছেন দীর্ঘদিন। প্রয়োজন অনুভব করছি আমরাও। আমাদের সকলের এই দীর্ঘ প্রত্যাশার তাগিদেই ইন্‌স্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্‌-এর প্রকাশন বিভাগের শুরু।

আজ শুভ দিন। নাটমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় আমাদের প্রথম বইটি প্রকাশিত হল। গভীর

গবেষণা, অনুচিন্তন, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, ব্যুৎপত্তি এবং অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল শ্রী অনুজন্ দাশগুপ্ত-র এই মূল্যবান, অতি-প্রয়োজনীয় বহু-আকাঙ্ক্ষিত বইটি নাট্যকর্মীদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আজ আনন্দিত, তৃপ্ত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার্থী অভিনয়-শিল্পী, নির্দেশক ও প্রশিক্ষকদের কাছে বাচিক অভিনয়ের উপর লেখা এই বইটি পরম-সহায়ক ও অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রচ্ছদ, কাগজ, অলংকরণ ও মুদ্রণের উৎকর্ষতার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। নাট্যরসিকদের সবরকম প্রস্তাব ও উপদেশ পরবর্তী সংস্করণে সশ্রদ্ধচিত্তে বিবেচিত হবার প্রতিশ্রুতি রইল।

সঞ্জীব চক্রবর্তী
॥ প্রকাশন বিভাগের পক্ষে ॥

সবিনয় নিবেদন

'গণনাট্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং 'নাট্যকলা', 'রঙ্গমঞ্চ' ও 'সংশপ্তক' পত্রিকাগুলোতে আংশিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো যথাযথ সম্পাদনার পর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হল। উদ্ধৃতিগুলো নতুন সংযোজন।

গবেষণা, অনুবাদ ও অনুলিখনে সাহায্য করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়, সর্বশ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী, দিলীপরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রকাশ নন্দী, তাপস সান্যাল, সুব্রত দত্ত এবং অঞ্জন শঙ্কর সেনগুপ্ত।

প্রবন্ধ রচনা ও গ্রন্থপ্রকাশে প্রেরণা দিয়েছেন 'ইন্‌স্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্'-এর সংগঠকমণ্ডলী এবং শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, 'গণনাট্য' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এবং জামশেদপুরের 'শিল্পায়ন' পরিচালিত 'নাট্যকলা বিদ্যালয়'-এর ছাত্রবৃন্দ।

এই গ্রন্থ প্রকাশে সার্বিক আর্থিক ঝুঁকি, মুদ্রণ-পরিকল্পনা ও প্রচারের দুঃসাহসিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করেছেন 'ইন্‌স্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্'-এর প্রকাশন বিভাগের প্রধান শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী। মুদ্রণ পারিপাট্যে আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন এ. পি. এণ্টারপ্রাইজেস-এর শ্রী কল্যাণ সরকার ও শ্রী অঞ্জন শঙ্কর সেনগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অর্থানুকুল্যে এই গ্রন্থটির প্রকাশ অনেকটা সহজতর হয়েছে।

অন্‌জন্‌ দাশগুপ্ত

বিষয় সূচী

প্রসঙ্গক্রমে

প্রসঙ্গক্রমে

একবার শিখে রাখলে সুন্দর বাচনভঙ্গি কখনই ভুলতে পারবেন না, চিরকাল তা অমূল্য সম্পদ হিসেবেই থেকে যাবে। কিন্তু এটি অবশ্যই শিখতে হবে। অনেকটা স্কেটিং শেখার মত, শুনতে যত সোজা মনে হয়, কার্যতঃ তা নয়। আবার স্কেটিং-এর মতই একবার শিখে রাখলে আর ভোলা যায় না: অনুশীলন এটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে।

— এফ. ই. ডোরেন

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, প্রতিদিন অনুশীলন করলে তবে কণ্ঠস্বরকে যথার্থ এক যন্ত্রে পরিণত করা যাবে।

— জেরী ব্লানট্

দৈবঘটনা কোনো কিছুর ভিত্তি হতে পারে না এবং ভিত্তি ছাড়া সত্যিকারের কোনো শিল্প হতে পারে না, নিছক অগভীর অনুরাগী হওয়া চলে। শিল্পের মধ্যে, বিশেষ করে বাচনভঙ্গি ও আবৃত্তিকলায় আমরা ভিত্তি গড়তে চাই। সৃজনশীল প্রয়োগে কণ্ঠস্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। এটিকে এখনই ভাল করে না শিখলে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন শিখতে পারবেন না। সৃজনীবৃত্তির পথের সমস্ত সন্ধিক্ষণে এটির অভাব নিরন্তর বাধার সৃষ্টি করবে।

— কনস্ট্যানটিন্ স্তানিস্লাভস্কি

কণ্ঠস্বর একটি উন্নত ধরনের জটিল যন্ত্র। পরিণত অথবা অপরিণত, যাঁরা এই উন্নত ধরনের জটিল যন্ত্রটির সাহায্যে চমৎকার সৌন্দর্যবোধবিশিষ্ট আনন্দের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন না, তাঁরা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্যবান। অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের এটির উপর অবশ্যই যথাযথ কতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। এমনকি অভিনয় যাঁদের বৃত্তি নয়, তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন বাচনভঙ্গিকে উন্নত করতে পারেন।

– ডেম্‌মী পেগী অ্যাশক্রফট্

যেহেতু বাচনভঙ্গি অভিনেতার প্রকাশের মাধ্যম, এ-বিষয়ে তিনি যা কিছু শিখবেন তাই তার কাছে মূল্যবান হবে।

— ক্রিষ্টিন এডওয়ার্ডস

প্রায়ই প্রাথমিক প্রশিক্ষণটিকে অবহেলা করা হয়। তার ফলও হয় মারাত্মক, এমনকি বেদনাদায়ক। নিখুঁত প্রকাশক যন্ত্রে পরিণত করতে হলে একটিমাত্র পথে কণ্ঠস্বরকে শিক্ষিত করে তোলা যায়—শব্দতত্ত্বের আবশ্যিক নিয়মগুলোকে প্রয়োগ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ও নিয়মিত অনুশীলন।

— গিয়্যনেথ থারবার্ন

কথা বলা আর বাকপটুতা এক বস্তু নয় — সুন্দর বাচনভঙ্গিও ভিন্ন জিনিষ।

— ডেন জনসন

যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই থিয়েটারের প্রাথমিক আবেদন, তাই সমস্ত নাটকীয় বৈপরীত্যের মধ্যেও বাচনভঙ্গির বৈচিত্র্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

— জন ফার্নাল্ড

কণ্ঠস্বর সহজাত, কিন্তু বাচনভঙ্গি একটি অর্জিত অভ্যাস। শিশুকে কান্না বা চীৎকার করা শিখতে হয় না, কিন্তু অনেক পরিশ্রমসাধ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাচনভঙ্গি শিখতে হয়।

— জে. ক্লিফোর্ড টার্নার

অন্য যে কোন সুন্দর যন্ত্রের মত কণ্ঠস্বরকে পরিশীলিত ও উন্নত করা যায়। এই শিক্ষার কাজটি প্রতিদিন, ধীরে ধীরে, যত্নসহকারে করা প্রয়োজন।

— সি. লাওয়েল লিস

অভিনয়বৃত্তির অন্যতম হাতিয়ার — কণ্ঠস্বর। অভিনেতার কণ্ঠস্বর যত বেশী সহজবশ্য হবে, অভিনয়ে সর্বোচ্চ ফল পাবার জন্য তত বেশী তা ব্যবহার করা যাবে।

— ডেরেক বাউস্কিল

অভিনেতার কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক ধর্মটি যেন মনোরম ও আনন্দদায়ক হয়, স্বরধ্বনির যথেষ্ট বিস্তার এবং চরিত্র ও মেজাজে অসংখ্য বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়।

— জন বোর্ন

কণ্ঠস্বর অভিনয়বৃত্তির প্রধান হাতিয়ারগুলোর মধ্যে একটি এবং বাকশক্তি এখনও একটি বৃহত্তম সার্বজনীন ফলপ্রদ মাধ্যম।

-- এমিল বেন্‌কে

অভিনেতাকে অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে পরিষ্কার উচ্চারণ করা যায়, কিভাবে দীর্ঘ সংলাপ বলার সময় নিঃশ্বাস নিতে হয় এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রিত ঝংকারে শব্দ প্রক্ষেপণ সম্ভব। তিনি অবশ্যই সংলাপের ভাব প্রকাশে সক্ষম হবেন, যথার্থ যতি ব্যবহার করে পরস্পরের সংগে সম্বন্ধ রেখে কথাগুলো সাজাবেন। পদবিন্যাস ও বিশেষ্যর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দগুলোকে কম গুরুত্বপূর্ণ করার সহজাত ক্ষমতাও তার থাকা চাই, তাৎক্ষণিক কার্যকারিতাকে খেয়াল রেখে শব্দগুলোকে পরিশীলিত করে বলা চাই। একই সময়ে সংলাপ প্রয়োগে থাকবে গীতিময়তা ও ছন্দ-মাধুর্য এবং মূল অর্থকে অটুট রেখেই সেই ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতকে প্রকাশ করতে হবে।

— জন গ্যাসনার

অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে, যাতে সে অভিনেয় চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ স্বরটিকে অনুকরণ করতে পারে এবং সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে চালিত হতে পারে।

— নর্মান লী

অভিনেতা বাচনভঙ্গিকে ব্যবহার করেন ঃ (ক) নাটকের কথাগুলো দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য (খ) সুরের ভিতর দিয়ে এই কথাগুলোকে বিশেষ অর্থবহ করার জন্য (গ) চরিত্রের প্রকৃতি ও মেজাজের তথ্য জানবার জন্য

[যেমন বয়স, সামাজিক অবস্থান, কর্মশক্তি, উত্তেজনা, হতাশা, ক্রোধ ইত্যাদি] (ঘ) সঙ্গীতের মত দর্শকের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং (ঙ) বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য। এ-সমস্ত জিনিষ যুগপৎ সম্পাদন করতে না পারলে আপনি একে সর্বোত্তভাবে কার্যকর করতে পারবেন না।

— হেনিং নেমস্

সম্ভবতঃ অভিনেতার কণ্ঠস্বর সর্বাধিক যে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হতে পারে তা হল — বৈচিত্র্য। এটি অন্যান্য বহুগুণের উপাদানে গঠিত এবং কঠোর প্রচেষ্টা ব্যতিত এটি পূর্ণবিকশিত হয় না। এটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের ফলশ্রুতি।

— কার্ল এ্যালেন্‌সওয়ার্থ

কণ্ঠস্বরকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে এটি মনোরম, নমনীয়, বর্ণময়, সুদৃঢ়, বৈচিত্র্যময়, হৃদয়গ্রাহ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়। শব্দ ও বাক্যগুলোর পরিষ্কার উচ্চারণ করতে হবে, সুরেলা ভঙ্গিতে বলতে হবে। শব্দগুলোর উপর ঝোঁক দিয়ে সহজ ও প্রকাশযোগ্যভাবে বলতে হবে। কণ্ঠস্বর উন্নত করা একটি কৌশলের ব্যাপার। শরীরচর্চার মত কণ্ঠস্বরটিকেও অবশ্য পরিশীলিত করতে হবে যাতে এর গুণগুলো শুধু দর্শকদের মনোযোগই কেড়ে নেবে না, সহজেই তাদের কাছে চিন্তা, কল্পনা এবং অন্তরের ভাব প্রকাশ করবে।

— আলেকজাণ্ডার ডীন

বাচনভঙ্গি হল গতি। কিন্তু একই সময়ে এটিও মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু এটি দৈহিক প্রক্রিয়া সেইহেতু কণ্ঠযন্ত্রটিকে নমনীয় এবং উত্তেজনাবর্জিত অবস্থায় রাখতে পারলে নমনীয় শরীরের মত নমনীয় কণ্ঠস্বরও অর্জন করা সম্ভব।

— কলিন কিং

সাধারণ সংলাপে চারটি আবশ্যিক উপাদান থাকে : একটি 'বিষয়বস্তু'— যা প্রকাশিত হবে, 'ভাষা' বা কথা—যার মাধ্যমে এই বিষয়বস্তুটি প্রকাশিত হবে, 'বাচনভঙ্গি'—যা কথাগুলোকে বোধগম্য করবে, এবং 'ধ্বনি' যা এদেরকে দর্শকের কানে পৌঁছে দেবে।

— মেরীয়ান রীচ

বাচনভঙ্গি শিশুর মত ঃ গর্ভে ধারণ করা সহজ, প্রসব করা কঠিন।

— ম্যালকম মরিসন

কিছু মানুষ সংলাপ বলাটিকে যত সহজ মনে করেন আসলে তত সহজ নয়। সংলাপ শুধুমাত্র কথোপকথনের মঞ্চরূপ নয়। এগুলো সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত, সংক্ষেপিত ও ঘনীভূত বাক্যসমষ্টি যা চরিত্র উদ্ঘাটনের জন্য, জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার জন্য এবং নাটকের ক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লেখক অতি শ্রমসহকারে দৃশ্যগুলোতে বিন্যস্ত করেন।

— ডব্লিউ. এন. ব্রিগ্যান্স

কণ্ঠস্বরের যে স্বাভাবিক গুণ যা লোকের ব্যক্তিগত বা নিজস্ব প্রশিক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না, কারণ মূলতঃ কণ্ঠস্বরের যে জন্মগত বা দেশজ গুণ সে হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে তার প্রকৃতিগত গুণ। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক জন্মসূত্রে পাওয়া গুণ। তা তাদের একান্ত নিজস্ব গুণ। বিবেচনাপূর্ণ প্রশিক্ষণ মানুষের কণ্ঠস্বরের উন্নতিসাধন করতে পারে, এবং তা করেও। এ ছাড়াও পারে আড়ষ্টতা দূর করে কণ্ঠস্বরের সহজতা আনতে ও শক্তি বাড়াতে যা সংখ্যাতীত প্রশিক্ষণবিহীন অভিনেতারা বুঝতে পারেন না, এমনকি কল্পনাও করতে পারেন না।

— অহীন্দ্র চৌধুরী

গভীর উপলব্ধির কণ্ঠ তৈরীর জন্য স্বরপ্রক্ষেপণের অনুশীলন দরকার।

— শম্ভু মিত্র

বাগাভিনয়ে প্রথমেই প্রয়োজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যা তিনগ্রামেই সমানভাবে বল রক্ষা করে অবলীলাক্রমে উঠানামা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ চাই—পরিস্ফুট উচ্চারণ, শব্দান্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ, তৃতীয়তঃ চাই অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য সমর্থ শব্দের অক্ষরের উপরে উপযুক্ত শ্বাসাঘাত দেওয়া। চতুর্থতঃ চাই—সুশ্রাব্য ও স্পষ্টার্থক করার জন্য বাক্যোচ্চারণে ছন্দ লয় যতি বজায় রাখা। পঞ্চমতঃ চাই প্রত্যেকটি শব্দকে দর্শকের কানে পৌঁছে দেওয়ার কৌশল। ষষ্ঠতঃ চাই—ভাব-ব্যঞ্জনার জন্য উপযুক্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সপ্তমতঃ চাই—চরিত্রানুসারে স্বরের পরিবর্তন।

— ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য

কন্ঠস্বর সমধিক সুমধুর ভাবময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া চাই ; ময়ূরকণ্ঠ কিংবা হংসকণ্ঠ হইলে চলিবে না, বিড়ালশিশুর বা কাদাখোঁচার ডাক ডাকিলে চলিবে না। সুমিষ্ট স্বর না থাকিলে যেমন কোনও ব্যক্তির গায়ক হইবার সাধ বিড়ম্বনা মাত্র, অভিনেতার পক্ষে উপযুক্ত স্বরাভাবে নায়করূপে অবতীর্ণ হওয়ার কল্পনাও প্রায় তদ্রূপ। খড় জড়াইয়া মোটা হওয়া চলে না, বেঁটে মানুষকে পিটিয়ে লম্বা করা চলে না, মিহি আওয়াজও গম্ভীর করা চলে না।

-- ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ

সুকন্ঠের অধিকারী হলেই যেমন সঙ্গীত শাস্ত্রে পারঙ্গম বা সুপণ্ডিত হওয়া যায় না, রাগ সঙ্গীতকে আয়ত্ত করতে হলে রীতিমত সঙ্গীত-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হয়, তেমনি সুধাকণ্ঠ হলেই উঁচুধরনের অভিনেতা হওয়া চলে না : তার জন্য দরকার হয় অনুশীলনের।

— নির্মল শীল

অভিনয় শিল্পে যুক্ত শিল্পীদের কণ্ঠস্বর মূল্যবান সম্পদ। এই কণ্ঠস্বরের সুরের পর্দার তারতম্য বজায় রাখা খুবই মূল্যবান। কবিতার মতো গদ্য সংলাপেরও সুর আছে যা কণ্ঠমাধুর্য বলে প্রতীয়মান হয়। কোনো কোনো সংলাপে স্বাভাবিক গভীর সুরের ব্যঞ্জনা থাকে ; সেটাও উপলব্ধি করতে হবে। একজন অভিনেতাকে সঙ্গীত সাধনার মতো থিয়েটারেও বাস্তবানুগ কণ্ঠসাধনা এবং স্বরক্ষেপণ অনুশীলন করতে হয়।

— সঞ্জীব সেন

অভিনেতাকে চরিত্রানুগ কণ্ঠস্বরের ব্যবহার করতে হবে অভিনয়ের সময়। স্বরবিন্যাসের টেক্‌নিক্ শিখতে হবে—সাধনার দ্বারা আয়ত্তকণ্ঠ হতে হবে।

— অশোক সেন

অভিনয় করার জন্য কি অনুশীলন বা তালিমের মধ্য দিয়ে ভালো কণ্ঠস্বর তৈরী করা যায় ? এক কথায় তার উত্তর—না, মোটেই না, কক্‌খনো নয়। তাহলে কণ্ঠস্বরের সাধনা নিয়ে এতো লেখালেখির মামলা মোকদ্দমা কেন ? উত্তর—কণ্ঠস্বরের জন্য নিয়ম বা ব্যবহারিক জ্ঞানের তালিম নিলে ভালো কণ্ঠস্বর তৈরী করা যায় না বটে কিন্তু ভালো কণ্ঠস্বর প্রকৃতি থেকে নিয়ে

জন্মালে তাকে কি করে আরো ভালো করা যায় এই শিল্প তার নির্দেশ দেয়। বিশেষ করে মঞ্চের এবং অভিনয়ের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর সৃষ্টির কাজে স্বরশিল্পের ব্যবহারিক জ্ঞানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

— প্রকাশ নন্দী

নাটক শুধু দৃশ্য কাব্য নয়, শ্রব্য কাব্যও বটে। নাটকের কাহিনী বিন্যাসে সর্বপ্রধান স্থান সংলাপের। অভিনেতাদের মুখে এই সংলাপের বিশিষ্ট উচ্চারণেই নাট্যকাহিনীর রসটি সহৃদয় সামাজিকের মানসপটে প্রমূর্ত হয়ে উঠে। সাজসজ্জা বা দৃশ্য রচনা সেই রসদ্বোধনের সাহায্য করে মাত্র। এমন কি যদি দৃশ্যসজ্জা না থাকে তাহলেও নাট্যকাহিনী বুঝতে দর্শকের কোন অসুবিধা হয় না, যদি অভিনেতারা সুষ্ঠুরূপে সংলাপ আবৃত্তিতে পারঙ্গম হন। কিন্তু যদি নাট্যকাহিনীর সংলাপ অংশ দুর্বল হয়, অথবা যথাযথভাবে অভিনেতারা তা আবৃত্তি করতে না পারেন, তাহলে হাজার কল্পনাপ্রবণ দর্শক হলেও, নাট্যকাহিনী তাঁর মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। দর্শকবৃন্দ ক্ষুণ্ণ হন, সমগ্র নাট্য-প্রযোজনা নির্মমভাবে নিদারুণ ব্যর্থতায় হয় পর্যবসিত। বাচনভঙ্গির স্থান তাই নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে প্রধান। পৃথিবীর সব দেশের নাট্য প্রযোজকরা, যুগে যুগে তাই এই বাচনভঙ্গির ওপরেই জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী।

— ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়

যে কোন অভিনেতার কাছে বাচিক অভিনয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ অভিনেতার ক্ষেত্রে এই বাচিক অভিনয়ে অনেক দুর্বলতা বা ত্রুটি থেকে যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় অভিনেতাদের মধ্যে উচ্চারণগত ত্রুটি, বাচনে একঘেয়েমী, কর্কশতা, চীৎকৃত অভিনয় বা নিম্নপর্দার বাচন-প্রয়াস। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তি পেতে হলে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুশীলন প্রয়োজন।

— ভূষণ রায়

অভিনেতার কন্ঠস্বর তাঁর অন্যতম প্রধান সম্পদ।

— ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

ডায়াফ্রাম ব্রিদিং

ডায়াফ্রাম ব্রিদিং

অভিনেতার প্রথম কর্তব্য সবাইকে সংলাপ শোনান। প্রথম সারিতে যাঁরা বসে আছেন শুধু তাঁরাই নন, প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকের কানে সংলাপ শ্রুত হওয়া চাই। এটি অবশ্যই অপরিহার্য।

— কার্ল এ্যালেন্সওয়ার্থ

এ্যামেচার অভিনেতাদের ব্যর্থতার কারণ কণ্ঠনালী থেকে স্বর বের করা—বক্ষের গভীর থেকে সংলাপ বলার পরিবর্তে কণ্ঠনালী থেকে সংলাপ বলা।

— এফ. ই. ডোরেন

মূকাভিনেতা, মঞ্চাভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী এবং নৃত্যবিদদের নিজস্ব শিল্পকর্মের অভ্যাস বা উপস্থাপনার সময় ডায়াফ্রাম থেকে শ্বাস নেয়া ও ছাড়া উচিত।

— রিচমণ্ড শেপার্ড

বাচনভঙ্গির বেশীরভাগ ত্রুটির কারণ হল দুর্বল এবং ভুল পদ্ধতিতে শ্বসন। উপযুক্ত শ্বসনে ডায়াফ্রাম, হৃদপিণ্ড ও ডায়াফ্রামের নিম্ন প্রান্তরেখার মধ্যবর্তী মাংসপেশীগুলোর সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। অধিকাংশ মানুষই ডায়াফ্রাম ও হৃদপিণ্ডের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করার পরিবর্তে হৃদপিণ্ডের শুধু উর্ধ্ব অংশের সাহায্যে শ্বাস নেন ও ছাড়েন।

— আলেকজাণ্ডার ডীন

'পেট থেকে কথা বলুন' উপদেশটি দৈহিক গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিভ্রান্তিকর হলেও অনেকটা সত্য বহন করে, কারণ অনভিজ্ঞেরা উত্তেজনা বশতঃ চিৎকার-চেঁচামেচি করেন এবং যে স্বর তাঁরা প্রক্ষেপণ করতে চান তা বেশ সার্থকভাবেই অপরিসর করে ফেলেন। ফুসফুসের তলদেশে ঘন চাপের সাহায্যে নিশ্বাস নিয়ে সবসময় সংলাপ বলবেন।

— জে. ক্লিফোর্ড টারনার

ডায়াফ্রামের নিম্ন প্রান্তরেখার মধ্যবর্তী শ্বসন স্বর-প্রক্ষেপণের জন্য সঠিক শ্বসন পদ্ধতি, কারণ এটি ঘাড় ও পাকস্থলীর মধ্যবর্তী দেহাংশের সর্বাধিক সমানুপাতিক প্রসারণে, শক্তিশালী মাংসপেশীগুলোর ব্যবহারে এবং ফুসফুসে বিশুদ্ধ বায়ু ভর্তি হতে সহায়তা করে।

— ডরোথী বার্চ

আমরা তো মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে পড়লে দাঁত মাজি না। প্রাত্যহিক দাঁত মাজার মত সঠিক শ্বসনপদ্ধতিটিকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। সঠিক পদ্ধতির শ্বসন ব্যতীত সুন্দর, সক্রিয় বাচনভঙ্গি অসম্ভব।

— ইয়োতি লেন

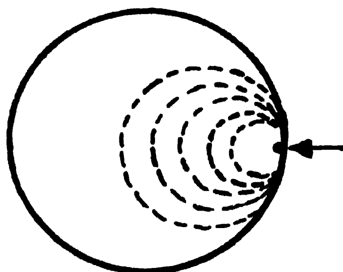
যেহেতু নাট্যাভিনয়ের প্রথম কথা হলো দর্শককে শোনান, সেই হেতু জোরে চিৎকার করলেই বুঝি সেই কার্য যথোচিত ভাবে সমাধা করা সম্ভব একথা অনেকে মনে করতে পারেন। আসলে তা নয়। Shouting is not acting, অর্থাৎ জোরে চিৎকার করলেই অভিনয় করা যায় না, একথা একজন অভিনেতাকে সদাসর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। কেননা তাতে দর্শকের শোনা দূরে থাক, গণ্ডগোলের সৃষ্টিটাই হবে সবচেয়ে বেশী।

— ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়

আমরা জানি যে অন্তর্বাহী অর্থাৎ ভেতরের শক্তিকে যদি ঠিকমত কাজে লাগাতে না পারা যায়, তাহলে কোনো বাদ্যযন্ত্রই বাজানো সম্ভব হয় না। সেই রকম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে যদি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারি, তাহ'লে আমাদের পক্ষে সুন্দর করে কথা বলাও সম্ভব হবে না।

— প্রবোধবন্ধু অধিকারী

নীচের ছবিটি একটি জলভর্তি থালার

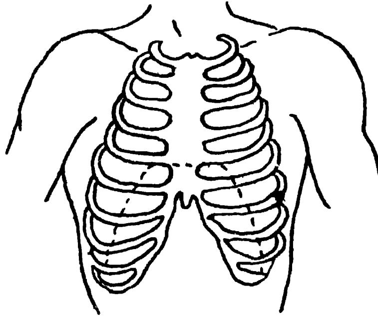


যেদিকে তীর চিহ্ন আছে সেখানে আলতো করে আঙ্গুল দিয়ে একটি টোকা দিন। যে ওজনের আঘাত থালাটিতে দেবেন জলের মধ্যে ঠিক সেই পরিমাণ তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। শব্দ প্রক্ষেপণের বিজ্ঞানটি এই রকম। বাতাস একটি অদৃশ্য নদীর মতো। মুখনিঃসৃত শব্দ বাতাসের ঢেউয়ের উপর ভাসতে ভাসতে শ্রোতার কানে গিয়ে পৌঁছায়।



শুধু কণ্ঠনিঃসৃত শব্দের শক্তিতে এই ঢেউয়ের সৃষ্টি হলে তার পেছনে যথেষ্ট চাপ ও গতি থাকে না। ফলে বহুদূর পৌঁছতে সে অক্ষম। অতএব, খুব জোরে চেঁচালেও দর্শক স্পষ্ট কিছু শুনতে পাবেন না। বরং, ক্রমাগত গলার উপর জোর দিলে তার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হতে বাধ্য, কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। এইভাবে হবে না। কৌশলটি অন্য রকম।

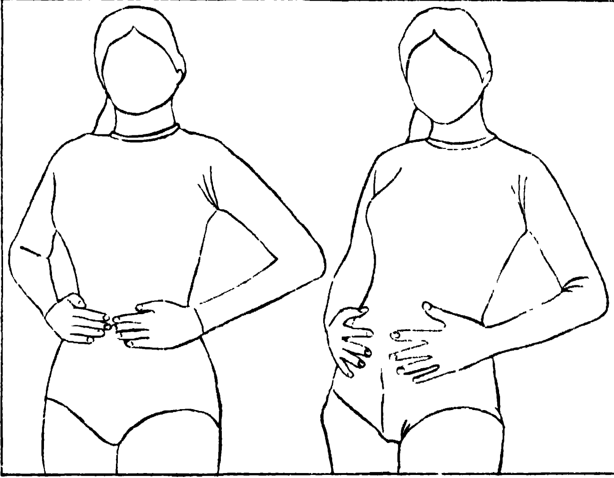
সমস্ত শব্দের সৃষ্টি বাতাস থেকে। বাতাসের আধার ফুসফুস। নীচের ছবিটি দেখুন।



আমাদের ফুসফুসটি ঐরকম পাঁজরা দিয়ে তৈরী খাঁচার মধ্যে আছে। বুক ও পেটকে আলাদা করার জন্য পেশী দিয়ে ঘেরা 'ডায়াফ্রাম' বলে একটি পর্দা আছে। ফুসফুসটি গলার হাড় থেকে ঐ ডায়াফ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। যে বাতাস আমরা নাক ও মুখ দিয়ে গ্রহণ করি সেটি প্রথমে যায় গলায়। তারপর যায় ফুসফুসে। ফুসফুসে যতটা দরকার ভরে দিয়ে চলে যায় পেটে। আবার নিশ্বাস ছাড়ার সময় ঐ বাতাসই পেট থেকে ফুসফুসে, ফুসফুস থেকে গলায় ও সবশেষে মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঐ বাতাসই প্রচুর পরিমাণে পেটের মধ্যে জমা করতে হবে ও সংলাপ বলার সময় পেট থেকেই সরাসরি বের করে আনতে হবে।

এই পদ্ধতিটি আয়ত্ব করতে গেলে সঠিক নিয়মটি জানা চাই। পরের পাতার ছবিটি দেখুন।



১। সোজা হয়ে দাঁড়ান।

২। হাতদুটো পেটের উপর এমনভাবে রাখুন যাতে আঙ্গুলের মাথাগুলো প্রায় ছুঁই-ছুঁই হয়।

৩। পরিপূর্ণভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস নেবার সময় বাতাস ধীরে ধীরে পেটের মধ্যে গিয়ে পেটটা বেলুনের মত ফুলে ওঠা চাই। পাঁজরার খাঁচাটিও যেন পাশাপাশি সম্প্রসারিত হয়। ঠিকমত করতে পারলে আঙ্গুলগুলো একে অপর থেকে সরে যাবেই।

৪। এবার হাতদুটো দিয়ে পেটের উপর চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস মুখ দিয়ে বার করে দিন। পেটটা বেলুনের মতো চুপসে যাবে, আঙ্গুলগুলো আবার পরস্পরকে ছোঁবে।

৫। দু'একদিন পরে পদ্ধতিটি রপ্ত হয়ে গেলে হাত দু'টো পেটের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে অভ্যাস করবেন। কয়েক সপ্তাহ অভ্যাস করলে সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি আপনা থেকে সংঘটিত হয়ে যাবে।

৬। কোন শব্দ বা সংলাপ বলে পরীক্ষা করে নেবেন নাভীমূল থেকেই কথা বলতে পারছেন কিনা। 'আ' শব্দটি একবার গলা ও একবার পেট থেকে বলার চেষ্টা করুন, তফাৎটি ধরতে পারবেন।

সর্ত :

১। শ্বাস নেবার সময় কাঁধ ও বুক উপর দিকে উঠবে না।

২। শরীরের অন্য কোন অংশ নড়বে না।

৩। সবসময় বুক চিতিয়ে ও না নাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়ামটি করবেন। তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পেট থেকে বাতাস বের হবে।

যদি এই পদ্ধতিতে অভ্যাস করতে প্রথমে খুব অসুবিধে হয়, তবে নীচের পদ্ধতিটি দিয়ে শুরু করতে পারেন।

ক) মেঝের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন।

খ) একটি হাত বুকে ও অন্যটি পেটের উপর রাখুন।

গ) বুকটি একটু উপরদিকে তুলে রাখুন। বুকটি একদম নড়াচড়া করবে না।

ঘ) এইবার নিঃশ্বাস নিন ও ছাড়ুন। স্বভাবিকভাবেই পেটটি নিঃশ্বাস নেবার সময় উঠছে ও ছাড়ার সময় নামছে।

ঙ) এটি আপনার 'দ্বিতীয় স্বভাব'-এ পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ব্যায়ামটি করে যান।

উপকারিতা :

১। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের পেছনে বাতাসের যথেষ্ট চাপ ও গতি থাকবে, ভল্যুম বাড়বে, সংলাপ শ্রুতিগ্রাহ্য হবে।

২। স্বরগ্রামের গভীরতা বাড়বে।

৩। কণ্ঠস্বরের মাধুর্য সমৃদ্ধতর হবে।

৪। কণ্ঠে সুর সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

৫। গলার কোনরকম ক্ষতি হবে না।

প্রাণায়াম

প্রাণায়াম

গায়ক যেমন গানের কথার সঙ্গে তাল রেখে গান গান, তেমনি সংলাপ বলার সঙ্গে শ্বাস নেয়া ও ছাড়াটিও সময় মত হওয়া আবশ্যক।

— এ. জেলিনেক

শ্বাস নেয়া ও ছাড়তে শেখা সমস্ত অভিনয়ের ভিত্তি। অর্থহীন বিরতি — যা সাধারণতঃ অনিয়ন্ত্রিত শ্বসন ক্রিয়ার জন্য ঘটে — একটি মারাত্মক অপরাধ।

— টাইরন গুথ্‌রিখ

সবসময় দম হারিয়ে ফেললে কোন অভিনেতাই ভালো অভিনয় করার আশা করতে পারেন না।

— এ. সিকিল্‌স

বাতাস হচ্ছে স্বরযন্ত্রের বারুদ। অতএব বাতাস নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

— ক্রিষ্টাবেল বার্নিসটন

আপনি যদি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করেন — বিশেষ করে সংলাপের শেষ বর্ণগুলো—এবং ঠিক জায়গায় দম নেন [একটি ছত্র বা অক্ষরের মাঝখানে নয়], তাহলে বেশ সহজভাবে সংলাপ বলতে পারবেন এবং বিশাল কক্ষের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা শোনা যাবে। কিছু পেশাদারী অভিনেতা এত দক্ষ যে তাঁদের ফিস্‌ফিস্‌ করে বলা সংলাপও বিরাট প্রেক্ষাগৃহের সব জায়গায় শোনা যায়।

— ডব্লিউ. এ. আইকেন

অভিনেতাদের গভীরভাবে নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা যেমন অভ্যাস করতে হবে তেমনি প্রয়োজনমত নিঃশ্বাস পরিত্যাগের উপরও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

— এলিস ফজারটি

প্রতি দশটি শব্দে একবার দম নেয়া উচিত। পাণ্ডুলিপিতে দম নেবার জায়গাগুলোতে দাগ দিয়ে নেবেন এবং প্রত্যেকবার সংলাপ পড়বার সময় ঐ জায়গাগুলোতে দম নেয়া অভ্যাস করবেন। মনে রাখবেন, পূর্ববর্তী অভিনেতার সংলাপ শেষ হবার আগেই আপনাকে দম নিতে হবে।

— ডগলাস ষ্ট্যান্লি

অনেক অভিনয় শিল্পীই সংলাপ বলার সময় মস্ত বড় একটি ভুল করে বসেন। কথার শেষের অক্ষরটি তাঁরা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন না, সংলাপের শেষ অংশ শোনাই যায় না। প্রথমে বেশ জোর দিয়ে সংলাপ বলা শুরু করে শেষ পর্যন্ত শেষের কথাগুলো নিজের কাছেই রেখে দেন।

— ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

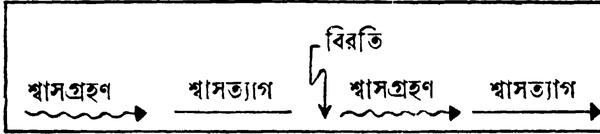
অনেক সময় বাক্য বলতে গিয়ে অভিনেতার দম ফুরিয়ে যায় বলে বাক্যের শেষ কথাগুলোর উপর জোর পড়ে না এবং সেজন্য সেগুলো প্রায়ই শ্রবণগোচর হয় না। নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে অভ্যাস করার দরকার যাতে নিঃশ্বাস অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখা যায় এবং প্রত্যেকটি বর্ণের উপর তাকে প্রয়োগ করা চলে।

— ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

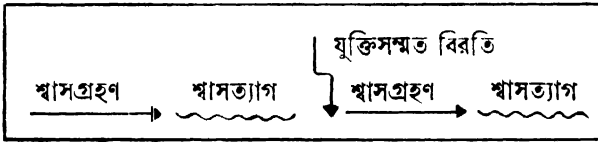
অভিনয়-কার্যের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হলো 'দম' ধরে রাখা। কেননা 'দম' না থাকলে বড় বড় সংলাপ বলতে গিয়ে অভিনেতা হাঁপিয়ে ওঠেন, সব সারির দর্শকের কাছে উচ্চারিত সংলাপ পৌঁছে দিতে পারেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, সংলাপ বলার সময় দম হারিয়ে ফেলার জন্য শেষের দিকে কথা বলার ঝোঁকটা কমে আসে, সুদীর্ঘ সংলাপের শেষের দিকের শব্দগুলো তাই প্রায়ই অনুচ্চারিত থেকে যায়।

— ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়

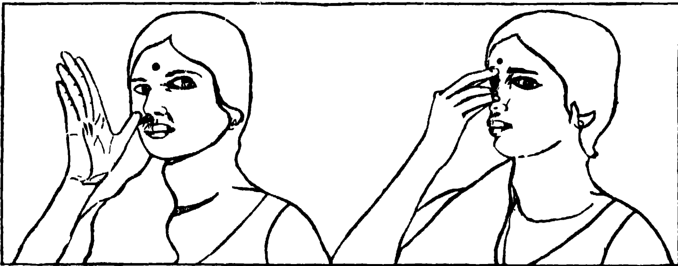
সাধারণ অবস্থায় আমরা ধীর গতিতে শ্বাস গ্রহণ করি, দ্রুতগতিতে শ্বাস ত্যাগ করি, সবশেষে একটু বিরতি দিই।



দীর্ঘ সংলাপ বলার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে দম ধরে রাখার জন্য ও সেই দমকে প্রয়োজন অনুযায়ী একটু একটু করে ছাড়বার জন্য অভিনয় শিল্পীর দরকার দ্রুত শ্বাস গ্রহণ, ধীর গতিতে শ্বাস ত্যাগ, সবশেষে যুক্তিসম্মত বিরতি।



এই নিয়ন্ত্রিত গভীর শ্বাসক্রিয়ার নাম 'প্রাণায়াম'। নীচের ছবি দু'টো দেখুন।



১। পিঠ সোজা করে বসুন।

২। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডানদিকের নাকের ছিদ্রটি বন্ধ করুন।

৩। বাঁদিকের নাকের ছিদ্রটি দিয়ে পাঁচ সেকেণ্ড ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে থাকুন।

৪। কুড়ি সেকেণ্ড দম বন্ধ করে রাখুন।

৫। এইবার কড়ে আঙ্গুল বা অনামিকার সাহায্যে বাঁদিকের ছিদ্রটি বন্ধ করুন। বুড়ো আঙ্গুলটি ডান নাক থেকে তুলে ফেলুন। ডান নাক দিয়ে পাঁচ সেকেণ্ড ধরে ধীরে ধীরে বাতাস বের করে দিন।

৬। আবার টাটকা বাতাস ঐ ডান নাক দিয়ে টেনে নিন।

৭। এইভাবে ক্রমান্বয়ে করতে থাকুন।

সর্ত :

১। রোজ পাঁচ থেকে দশ মিনিট অভ্যাস করবেন।

২। যে কোন সময় করতে পারেন। তবে খুব ভোরে করতে পারলে ভালো হয়।

৩। শ্বাসগ্রহণ যতদূর সম্ভব গভীর হওয়া চাই।

৪। শ্বাস নেবার ও ছাড়বার সময় পেটটি ফুলবে ও চুপসে যাবে — 'ডায়াফ্রাম ব্রিদিং'-এর সর্তটিও এখানে মানতে হবে।

উপকারিতা :

১। নিয়মিত 'প্রাণায়াম' করলে দম বাড়বেই। দম ধরে রাখতেও শিখবেন।

২। গভীর ও ছন্দিত শ্বাসক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা জন্মাবে।

৩। স্নায়ুমণ্ডলী সবসময় সতেজ ও সক্রিয় থাকবে।

৪। ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা বাড়বে। স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি শানিত ও মার্জিত হয়ে উঠবে।

৫। গভীর অভিনিবেশের ক্ষমতা আসবে।

৬। যাদের 'সাইনাস' অথবা বধিরতা আছে তাদের পক্ষে এই 'প্রণায়াম' বিশেষ উপকারী।

অনুশীলনী : ১

সামনে একটি রিষ্টওয়াচ বা টাইমপিস রাখুন।

ক) পাঁচ সেকেণ্ড ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন।

খ) দশ সেকেণ্ড ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন।

গ) এরপর সাধ্যমতো শ্বাস ছাড়ার সময়টি পনেরো, কুড়ি, তিরিশ ও সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পর্যন্ত বাড়াবার চেষ্টা করুন। শ্বাস নেবার সময়টি ঐ পাঁচ সেকেণ্ডই রাখবেন, বাড়াবেন না।

সর্ত :

তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবেন না। প্রতিদিন একটু একটু করে সময় বাড়াবেন।

উপকারিতা :

১। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ধীর গতিতে শ্বাস ছাড়তে শিখবেন।

২। শ্বাস ত্যাগের সময়টি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩। শ্বাস গ্রহণের সময়টি থেকে শ্বাস ত্যাগের সময়টি দীর্ঘতর হবে।

৪। দম ফুরিয়ে যাবে না। ধীরে ধীরে দম ছাড়ার অভ্যাসটিও হয়ে যাবে।

অনুশীলনী : ২

প্রচণ্ড হাঁপিয়ে পড়লে কুকুর যেভাবে জিভ বের করে শ্বাস নেয়, ঠিক সেই ভাবে বসে অথবা দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত শ্বাস নিন ও ছাড়ুন।

সর্ত :

১। এইভাবে পনেরো—কুড়িবার করার পর বিশ্রাম নেবেন। আবার করবেন।

২। জিভটি বেরিয়ে থাকবে সারাক্ষণ।

৩। শুধু পেটটাই ওঠানামা করবে।

৪। মুখ দিয়ে সমান গতিতে করাত দিয়ে কাঠ কাটার মত আওয়াজ বেরোবে।

৫। ক'বার করলেন মনে মনে গুনবেন।

৬। কাশি আসতে পারে, একটু জল খেয়ে নেবেন।

উপকারিতা ঃ

১। দম বাড়বে।

২। ফুসফুস সবল হবে।

৩। গলা পরিষ্কার হবে।

অনুশীলনী ঃ ৩

গভীরভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় এক থেকে এক'শ পর্যন্ত সংখ্যা জোরে জোরে বলুন।

সর্ত ঃ

১। সমান গতিতে বলবেন।

২। শেষের অক্ষরগুলোতে জোর দিয়ে বলবেন। যেমন—তেরো, ছাব্বিশ, আটত্রিশ, ছিয়াত্তর, আটানব্বই ইত্যাদি।

উপকারিতা ঃ

১। 'টেইল ড্রপিং'-এর ত্রুটি দূর হবে।

২। গতির উপর নিয়ন্ত্রণ আসবে।

অনুশীলনী ঃ ৪

নীচের কবিতাটি জোরে জোরে পড়ুন।

ক) প্রত্যেকটি লাইন পড়ার আগে গভীরভাবে শ্বাস নেবেন।

খ) এক দমে এক একটি লাইন বলবেন।

গ) লাইনের শেষ অক্ষরটি বলার সময় দম শেষ হয়ে যাওয়া চাই।

ঘ) প্রথম থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত স্থির ও সমান স্বরভঙ্গি রাখবেন।

ঙ) প্রত্যেকটি অক্ষর যেন স্পষ্ট শোনা যায়।

"রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি মায়া।

আমি কালো মেঘ নামি যদি তব বাতায়ন পাশে বৃষ্টিধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে।
সুখ বিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা — নয়নের জল দুর্বিসহ।
ফাল্গুন বনে মাধবী বিতানে সে পিক নিয়ত ফুকারি ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্রতপ্ত ঠোঁটে।
জানি না সে ভাষা, হয়ত বা জানি, ছ'ল করে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি — নেমেছে বাদল রৌদ্রজ্জ্বল গগন বাহি।"

[প্রেমের কবিতা — নজরুল ইসলাম]

উপকারিতা ঃ

১। দম কতখানি বেড়েছে বুঝতে পারবেন।

২। 'টেইল ড্রপিং' হবে না।

৩। সংলাপ বলার সময় যেখানে বিরতির প্রয়োজন, ঠিক সেখানে ইচ্ছেমতো বিরতি দিতে পারবেন। আগে বা পরে দম ফুরিয়ে যাবার জন্য অর্থহীন বিরতির শিকার হবেন না।

৪। সংলাপ বলার আগে প্রয়োজন মতো দম নিতে শিখবেন।

অনুশীলনী ঃ ৫

নীচের পাঁচটি সংলাপ আলাদাভাবে একদমে পড়ার চেষ্টা করুন।

ক) মাঝপথে দম নেবেন না।

খ) একদমে স্বচ্ছন্দভাবে প্রথম সংলাপটি বলতে না পারলে, দ্বিতীয় সংলাপটি বা পরের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংলাপটি বলার চেষ্টা করবেন না।

গ) তাড়াতাড়ি বলবেন না। প্রত্যেকটি শব্দই স্পষ্টভাবে বলবেন।

প্রথম সংলাপ ঃ

"তোমাদের এই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।"

[রক্তকরবী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

দ্বিতীয় সংলাপ ঃ

"আমার ইচ্ছা হল যে দেখে আসি — কি সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে ; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্য যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে।"

[চন্দ্রগুপ্ত — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

তৃতীয় সংলাপ ঃ

"সত্যের জন্ম হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে সিন্ধু গঙ্গার উপত্যকায়—নীল নদের তীরে — ইয়াংসিকিয়াং আর হোয়াংহোর অববাহিকায় — জেরুজালেমের প্রান্তরে — সে সত্য অত্যন্ত প্রাচীন — সে সত্য কোন বাচাল অর্বাচীন উত্তরপুরুষের হুমকির জবাবদিহি করেনা।"

[এখন যুদ্ধ — প্রণব মিত্র]

চতুর্থ সংলাপ ঃ

"আজ তবে এইরূপ নির্বানোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে উঠুক, এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক ; আজিকার সুখ বিপদের মতো কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মতো কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন একটা চুম্বনে মরে যাক।"

[সাজাহান — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

পঞ্চম সংলাপ ঃ

"যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী করে তোমায় পান করিয়েছিল — যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষ চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল, রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দিনে তোমার দুঃখ যে বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহ মন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে— এই সেই মা।"

[চন্দ্রগুপ্ত — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

উচ্চারণ

উচ্চারণ

স্পষ্ট উচ্চারণের ব্যাপারটার উপরই অভিনেতার সবার আগে মনোনিবেশ করা দরকার। দর্শকদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশেরও একমাত্র উপায় হচ্ছে স্পষ্ট উচ্চারণ। অভিনেতা যখন মঞ্চ থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্য করেই সংলাপ বলেন তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে দর্শকরাও আশা করবেন যে ঐ সংলাপ যেন স্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যায়। খেতে বসে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে যখন কথা বলি, তার মধ্যে অনেক সময় কথা আটকে যায়, পুনরুক্তি হয়, ভুল শুধরে নেয়া হয়, চিবিয়ে কথা বলা হয়—কিন্তু এ ভঙ্গিতে মঞ্চের উপর সংলাপ বললে দর্শক তা বুঝতে পারবে না—মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠবে এই অস্পষ্ট বকবকানি শুনতে শুনতে। থিয়েটার তো আর ড্রইংরুম নয়—এখানে ১৫০০ দর্শককে উদ্দেশ্য করে অভিনেতাকে সংলাপ বলতে হচ্ছে—সুতরাং চিমনির পাশে বসে দু'পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলা হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী উঁচুপর্দায় মঞ্চের উপর থেকে সংলাপ বলতে হবে এবং সব সময় দেখতে হবে, কথা যেন জড়িয়ে না যায়—উচ্চারণ যেন স্পষ্ট হয়। তা না হলেই দর্শকের কাছে অভিনয়ের সংলাপ অর্থহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠবে।

— কঁন্স্তা ককেল্যাঁ

মঞ্চাভিনয়ে সহজ, সরল এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করাটাই সর্বদিক দিয়ে বিধেয়। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। অভিনয় করতে

গিয়ে সব সময়ই অভিধানের ব্যাকরণ অনুসারে উচ্চারণ করা চলে না। সিসেরোর মত বিখ্যাত ব্যক্তিও বলে গেছেন "ভাবপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ উচ্চারণের তারতম্যের প্রয়োজন হতে পারে। আবশ্যকমত ভেঙ্গে বা কেটে কেটে কথা বলতে হতে পারে শব্দের বৈচিত্র্যের জন্য ; উচ্চারণেও বৈচিত্র্য প্রয়োজন হতে পারে। চিত্রশিল্পী যেমন নানাবর্ণের সমাবেশে সুন্দর চিত্রের সৃষ্টি করেন, অভিনেতাও তেমনি তাঁর অভিনয় রঙে, রসে, প্রাণে ভরপুর করে তোলেন শব্দের উচ্চারণ বৈচিত্র্যে। ভাব এবং চিন্তাধারার প্রকাশের জন্যই শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। উচ্চারণের কঠিন অনুশাসনে সেই উদ্দেশ্যই যদি ব্যাহত হয় তবে তাকে অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় কি ! আনন্দের অভিব্যক্তি এবং দুঃখের অভিব্যক্তির মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান—এই বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে গিয়ে দরকার মত স্বাভাবিকতা বজায় রেখে শব্দোচ্চারণ করতে হবে এবং সেজন্য অভিধানগ্রাহ্য উচ্চারণের নিয়মকেও অগ্রাহ্য করা চলবে।

— হেনরী আরভিং

সময়ানুবর্তিতা যেমন রাজার শিষ্টাচার, স্পষ্ট উচ্চারণ তেমনি অভিনেতার শিষ্টাচার।

— সি কর্কেলিন

সুর সুন্দর — কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ আরো সুন্দর।

— ভ্যান এইচ. কার্টমেল

দৈনন্দিন জীবনে বহুসংখ্যক দুর্বল উচ্চারণ শোনা যায়, ত্রুটিগুলো সাধারণতঃ মেনেও নেয়া হয়। কিন্তু মঞ্চের উপর এটি একটি গুরুতর ব্যর্থতা।

— ক্লড. ই. কেন্টনার

স্পষ্ট উচ্চারণ গান গাওয়ার মতই শক্ত, এর জন্য প্রশিক্ষণ ও কলাকৌশলের প্রয়োজন।

— কন্‌সট্যান্টিন্ স্তানিস্লাভস্কি

থিয়েটার সমাজকে প্রতিফলিত করে এবং সমাজে মানুষেরা বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করেন। অতএব যত বেশী লোকের উচ্চারণ শিখতে পারবেন ততই ভালো।

— ক্লাইভ সুইফট্

সেই অভিনেতার সংলাপ শুনতে সত্যিই আনন্দ হয়, যে অভিনেতা সংলাপকে উজ্জ্বল রঙের মত স্পষ্ট উচ্চারণে বিচ্ছুরিত করতে পারেন।

— এন. চেরকাশোভ

তৎপরতা ও নমনীয়তার অধিকারী হওয়ার জন্য ঠোঁট ও জিভের পেশীগুলোকে সক্রিয় রাখা উচিত। বাগযন্ত্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ শুধু স্পষ্ট ও শ্রুতিগম্য বাচনভঙ্গির সৃষ্টি করে না, সুরের উন্নতি সাধনেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

— ফ্র্যাঙ্ক জোন্‌স

যদি কোন শব্দের দু'টো প্রচলিত উচ্চারণ থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি একটি আপস-মীমাংসা সম্ভব হয়, তাহলে আপস-মীমাংসাকেই বেছে নেবেন।

— জে. আইসেন্‌সন

যেখানে উচ্চারণ কেমন হবে তা বেছে নেবার প্রয়োজন হয়, সেখানে প্রচলিত ব্যবহার, নাটকের স্থান ও চরিত্র বিচার করেই অভিনেতা উচ্চারণ করবেন।

— আঁদ্রে বুলার্ড

উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে যেমন শরীরে স্থূলতা আসে, ঠিক তেমনি বাগযন্ত্রের বিভিন্ন পেশীর ব্যায়াম না করলেই উচ্চারণ অমার্জিত হয়।

— ম্যালকম মরিসন্

বাগযন্ত্রের সঠিক ব্যবহার ব্যতীত ফলপ্রসূ বাচনভঙ্গির সৃষ্টি অসম্ভব।

— ডি. এ্যাবারকম্‌বী

অভিনয়ের কণ্ঠ শুধু কেবল উদাত্ত ও গম্ভীর হলেই চলে না, তাকে স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত হতে হবে। সেজন্য উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ও মার্জিত হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণের ফলে একটি ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী আর একটি ধ্বনির উচ্চারণ মিশে যায়।

— ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

আমার সন্দেহ হয় (অবশ্য ভুল হতে পারে) যে অনেকে ঠোঁটকে বিস্তৃত করা বা চোয়াল খুলে কথা বলাকে আধুনিক ও সভ্য বলে মনে করেন না। তাই ঐ বন্ধ চোয়াল অবস্থায় উচ্চারণ করতে গিয়েই অ-গুলো ছোট আ-এর মত হয়ে

যায়, ই-গুলো এ-র মত হয়ে যায় . . . বাঁধনহীন এই উচ্চারণ (বিকৃতি না প্রগতি ?) উত্তরকালে বোধহয় আমাদের একটু বিপদেই ফেলবে . . . যাই হোক এই সব ব্যাপারে একটা মীমাংসা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। অভিনেতাদের পক্ষেতো আবার বেশী করেই প্রয়োজনীয়, কারণ অভিনেতারাই তো সমাজে শুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর বাচনভঙ্গির মান স্থাপন করবেন। অনেকানেক দেশে তা হয়েও এসেছে।

— শম্ভু মিত্র

যাহার আবৃত্তি সুস্পষ্ট ও প্রমাদ শূন্য নহে, তাঁহার অভিনয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। . . . প্রত্যেক কথার প্রত্যেক বর্ণটি নির্ভুল করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। মুড়ি ও মিছরীর কখনো একদর হইতে পারে না, পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে। হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর কখনো সমভাবে উচ্চারিত হইতে পারে না। . . . প্রতি কথাটি অভিনেতার মুখ হইতে মুক্তার মত ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়া চাই, তাহাতে কোনরূপ কুণ্ঠা বা জড়তা থাকা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ . . . যাহার জিহ্বার জড়তা ঘুচে নাই, তাহাকে নির্ভুল ও সুস্পষ্ট আবৃত্তি করাইবার জন্য লাঠালাঠি করা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেকে মুখের আড় ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে বড় বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় জিনিসটার যেরূপ পরকাল ঝরঝরে করিয়া দিয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের নাট্যকলা যে ক্রমে সর্বনাশের পথে যাইতে বসিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

— ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

সাধারণতঃ ঠোঁট ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারলেই সংলাপ বলার সময় অস্পষ্টতা দোষ দেখা দেয়। আধবোজা মুখ, তালুর নরম অংশের আলগা ভাব, জিহ্বার আড়ষ্টতা বা তাড়াতাড়ি কথা বলা—এসব কারণেও সংলাপ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

— অশোক সেন

যদি দর্শকরা তোমার কথা স্পষ্ট শুনতে না পায়, ভাল অভিনয় করে কোন লাভ নেই। অভিনয়ের এটাই প্রথম ও আসল শিক্ষা।

— উমা আনন্দ

বাংলা নাটকের সংলাপ প্রধানতঃ কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মৌখিক ভাষা—"আদর্শ কথ্য ভাষায়" রচিত ও অভিনীত হয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বৈয়াকরণরা একে 'চলিত ভাষা' আখ্যা দিয়েছেন। সুকুমার সেন একে বাংলাভাষার 'শিষ্টরূপ' নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি জন-মাধ্যমে এই "আদর্শ কথ্যভাষা"-ই ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ

সাধুভাষা	আদর্শ কথ্যভাষা
আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম	আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম
অথবা	অথবা
আমি ঘরে ফিরিলাম	আমি ঘরে ফিরলাম

এছাড়া রয়েছে পুরুলিয়া, ঢাকা, যশোহর, খুলনা, বাঁকুড়া, বরিশাল, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি নানা আঞ্চলিক ভাষা। বাংলা নাটকে এদের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ কোন একটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সর্বশ্রেণীর দর্শকের পরিচয় থাকার কথা নয়। একটি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত নাটক অন্য আঞ্চলিক ভাষার দর্শকদের কাছে কতখানি বোধগম্য তাও ভাবার ব্যাপার আছে। কিন্তু "আদর্শ কথ্যভাষা"-র পরিচিতি অনেক ব্যাপক। এই ভাষা জনমাধ্যমরূপে স্বীকৃত। তাই "আদর্শ কথ্যভাষা"-তেই বেশী নাটক রচিত ও অভিনীত হচ্ছে।

"আদর্শ কথ্যভাষা"-ও সব বক্তার মুখে সর্বত্র একইভাবে উচ্চারিত হয় না, খানিকটা স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। যেমন, 'অত্যন্ত'-কে কেউ কেউ বলেন 'ওৎতনতো', আবার কেউ বলেন 'ওৎতোনতো'। উচ্চারণের এই সামান্য তফাৎটুকু সর্বদাই গ্রহণযোগ্য (কিন্তু 'অত্যন্ত'-র প্রথম 'অ' স্বরবর্ণটির উচ্চারণ কখনই 'অ'-এর মত হবে না — 'ও'-র মত হবে)।

কিছু কিছু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের দু'রকম উচ্চারণই চালু রয়েছে। যেমন, একাঙ্ক—এ্যাকাঙ্ক, একতা—এ্যাকতা, একান্ন—এ্যাকান্ন, গাঢ়ো (Garho)—গাড়ো (Garo), একাংশ—এ্যাকাংশ, আবৃত্তি—আববৃত্তি, অমৃত—অম্‌মৃত, হিংস্র—হিংঅস্র, দরজা—দর্‌জা, সংস্কৃত—সংঅস্কৃত ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে একটিধারাই অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। একবার 'একাঙ্ক', আর একবার 'এ্যাকাঙ্ক' বললে ছন্দপতন ঘটবে।

'আদর্শ কথ্যভাষা'-য় রচিত নাটকগুলোতে অনেক সময় সাহিত্যের খাতিরে বা নাটকীয়তা বজায় রাখার জন্য সংস্কৃত শব্দেরও ব্যবহার হয়। যেমন, মুখে কখনও বলি না 'সলিল'—বলি জল, কিন্তু নাটকে এই 'সলিল' শব্দটি 'সলিল সমাধি ঘটেছে' এইভাবে ব্যবহৃত হয়। তেমনি 'ভাত খান'-কে 'অন্ন গ্রহণ করুন', 'ছোঁবনা'-কে 'স্পর্শ করব না' এইরকম ব্যবহার হয়।

বাগযন্ত্র ঃ বাকরীতি

গলা, নাক, জিভ, ঠোঁট, দাঁত, চোয়াল ও তালু—এই সাতটি হচ্ছে বাগযন্ত্র—কথা বলার যন্ত্র। বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় 'ধ্বনি', ধ্বনি লিখিত হয় 'বর্ণে'। বর্ণের সমাহারে আকার পায় 'অক্ষর', যেমন, ভাষা—এই শব্দটিতে দু'টি অক্ষর আছে। কিন্তু বর্ণ আছে চারিটি—ভ্‌ । আ + ষ্‌ । আ। বাংলা বর্ণমালায় মোট ৪৭টি বর্ণ আছে, ১২টি স্বরবর্ণ, ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণের উচ্চারণ

(অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ) ১২টি স্বরবর্ণের মধ্যে 'ঌ' কারের কোন ব্যবহার নেই, 'ঋ'-এর উচ্চারণ এখন ব্যঞ্জনবর্ণের 'রি'-র মত।

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান
অ, আ	গলা
ই, ঈ	তালু
উ, ঊ	ঠোঁট
এ, ঐ	গলা ও তালু
ও, ঔ	গলা ও ঠোঁট

স্বরবর্ণের উচ্চারণ তিন রকম—

১। হ্রস্ব — উচ্চারণে অল্প সময় লাগে। অ, ই, উ—এই তিনটি হ্রস্ব।

২। দীর্ঘ— উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ঔ—এই ছ'টি দীর্ঘ।

৩। প্লুত— দূর থেকে ডাকা, গান, শোক অথবা কান্নার সময় স্বর দীর্ঘতর হয়। যেমন 'রা-খা-ল', 'আলো আমার আলো ওগো, আলোয় ভুবন ভরা', 'ওরে আমার কি হ'ল রে' ইত্যাদি।

বর্তমানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। শুধু একাক্ষর পদের স্বরই সাধারণতঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ

হ্রস্ব	দীর্ঘ
ফলটি	ফ - ল
একা	এ - ক
দীনতা	দী - ন
চীনা	চী - ন
নামা	না - ম
যোগী	যো - গ
রোগা	রো - গ
রূপা	রূ - প
কালো	কা - ল
জলা	জ - ল
দিন-কাল	দি - ন
দীন-দুঃখী	দী - ন

হ্রস্ব	দীর্ঘ
দোলা	দো - ল
ভোলা	ভো - ল
গুণ	গুণ - বান
লোক	লো - কটি
এক	একা - কার

অনেক ক্ষেত্রে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে স্বরবর্ণের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব উচ্চারণে চরিত্রের ভাব বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হয়। যেমন,

১) 'আপনি কি জানেন' আর 'আপনি কি-ই জানেন' এ দুটোর তফাৎ যদি উচ্চারণে ধরা না পড়ে তবে অর্থটি পাল্টে যাবে।

২) হাস্যরস সৃষ্টিতে 'জল খাবো' কথাটি উচ্চারণে 'জল' যদি হ্রস্ব হয়, একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ ঐ 'জল খাবো' কথাটি বললে এই 'জল' এর উচ্চারণ দীর্ঘ হবে।

৩) 'কি বলছ' কথাটি যদি খুব শান্ত ও নিরুত্তাপ স্বরে বলা হয় তবে 'কি' স্বরটি হবে হ্রস্ব। কিন্তু ঐ কথাটিই বিরক্তি বা রাগের প্রকাশ হলে, স্বরটি হবে দীর্ঘ। নাট্যকার হয়ত এই 'কি' শব্দটি দুটো ক্ষেত্রেই হ্রস্ব 'ই'-কার দিয়ে লিখতে পারেন। সংলাপের অর্থটি বুঝে কোন্ 'কি' দীর্ঘ উচ্চারণ হবে তা ঠিক করতে হবে।

'অ' এর তিন রকম উচ্চারণ

১) 'অ'-এর মত উচ্চারণ।

২) 'ও'-এর মত উচ্চারণ।

৩) হসন্ত-র মত উচ্চারণ।

যেখানে প্রথম অক্ষর 'অ'-এর মত উচ্চারণ হবে

(উচ্চারণে 'অ' ও 'আ' বোঝাতে যথাক্রমে অ = a এবং আ = A ব্যবহার করা হয়েছে।)

সূত্র		উদাহরণ	
		শব্দের বানান	শব্দের উচ্চারণ
১	শব্দের প্রথমে 'না' অর্থে 'অ' বা অন্ থাকলে।	অস্থির অনিত্য অধীর অকুল অনুদার	asthir anityo adhir akul anudAr
২	শব্দের প্রথমে 'সহিত' বা 'সম্পূর্ণ' অর্থে অথবা 'সম' বা 'স' থাকলে।	সম্পূর্ণ সক্ষম সমৃদ্ধি সম্প্রীতি	shampurno shakhom shamriddhi shampriti
৩	একাক্ষর শব্দ হলে।	ফল জল ঘর পথ	phal jal ghar path
৪	প্রথম শব্দ 'অ' ও দ্বিতীয় শব্দ 'অ' বা 'আ' থাকলে।	সকল করা বলা	shakol karA balA
৫	ধ্বন্যাত্মক শব্দ হলে।	কচ্ কচ্ খপ্ খপ্	kach kach khap khap

যেখানে প্রথম অক্ষর 'ও'-র মত উচ্চারণ হবে

	সূত্র	উদাহরণ	
		শব্দের বানান	উচ্চারণ
১	পরের শব্দ ই, ঈ, উ. ঊ, হলে।	অতি অসি অতিশয় অগ্নি সমুদ্র পরিশ্রম পরীক্ষা	ওতি ওসি ওতিশয় ওগ্নি সোমুদ্রো পোরিশ্রোম পোরীক্ষা
২	পরের শব্দে 'য' যুক্ত হলে।	সত্য অত্যাচার গণ্য লভ্য নব্য	সোত্যো ওত্যাচার গোণ্যো লোভ্যো নোব্ বো
৩	'ক্ষ' পরে থাকলে।	লক্ষ্য যক্ষ কক্ষ অক্ষর	লোক্ষো যোক্ষো কোক্ষো ওক্ষর
৪	পরের শব্দে 'ঋ' ফলা যুক্ত হলে।	বক্তৃতা মসৃন কর্তৃ	বোক্তৃতা মোসৃন কোর্তৃ
৫	র-ফলাযুক্ত শব্দের সাথে অ-যুক্ত থাকলে। ব্যতিক্রম—'য়' পরে থাকলে হবেনা। যেমন—'ক্রয়'	শ্রম ভ্রমর	শ্রোম* ভ্রোমোর

* সমাসবদ্ধ পদের প্রথম উপাদান হলে অবশ্য 'শ্রম' শব্দটির উচ্চারণ হবে শ্রোমো। যেমন, শ্রমসাধ্য=শ্রোমোসাধ্য। এইরকম, পথসভা=পথোসভা, ভাব-ব্যঞ্জনা=ভাবোব্যঞ্জনা, গীতবিতান=গীতোবিতান ইত্যাদি।

	সূত্র	উদাহরণ	
		শব্দের বানান	উচ্চারণ
৬	'প্র' শব্দ আগে থাকলে।	প্রণাম প্রবেশ প্রমাণ প্রভাত প্রত্যেক প্রথম	প্রোণাম প্রোবেশ প্রোমাণ প্রোভাত প্রোত্যেক প্রোথোম
৭	একাক্ষর শব্দের শেষে 'ন' বা 'ণ' থাকলে। ব্যতিক্রম—প্রতিজ্ঞা অর্থে 'পণ' বা 'শণ' 'রণ' ও 'গণ'।	মন বন ধন ক্ষণ	মোন বোন ধোন ক্ষোণ
৮	বড় শব্দকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ভেঙ্গে নিলে অথবা তিন অক্ষরের শব্দ দু' অক্ষরের মত উচ্চারণ করলে ও শেষে 'অ' থাকলে মাঝের ও শেষের অক্ষরের 'অ'-এর উচ্চারণ।	শ্রাবণ অনবরত কারণ হতভম্ব ঘাতক অনল পিতল অনন্য ন্যায়দণ্ড	শ্রাবোণ অনোবরোতো কারোণ হতোভম্বো ঘাতোক অনোল পিতোল অনোন্যো ন্যায়দণ্ডো
৯	১১ থেকে ১৮ সংখ্যাগুলোর শেষের 'অ'-এর উচ্চারণ।	১১ ১২ ১৩	এগারো বারো তেরো

	সূত্র	উদাহরণ	
		শব্দের বানান	উচ্চারণ
১০	দ্ব্যক্ষর শব্দের শেষে 'হ' 'ড' 'ঢ' 'ং' 'ʼ' ফলা ও 'ব'-ফলা থাকলে।	বাক্য ঐক্য সত্য মোহ দেহ বিদ্রোহ গাঢ় বংশ	বাক্কো ঐক্কো সোত্তো মোহো দেহো বিদ্রোহো গাড়হো বংশো
১১	দ্ব্যক্ষর শব্দের প্রথম অক্ষরে 'ৃ' অথবা 'এ' বা 'ঐ' থাকলে শেষের 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' হবে।	বৃষ তৃণ গৌণ মৌল শ্রেয়	বৃষো তৃণো গৌণো মৌলো শ্রেয়ো
১২	'তর', 'মত' থাকলে।	গুরুতর প্রিয়তম ক্ষুদ্রতর	গুরুতরো প্রিয়তমো ক্ষুদ্রতরো
১৩	বিশেষ শব্দের আদ্যক্ষর 'ও' হবে।	মন্দ মন্ত্র মন্ত্রণা মঙ্গল	মোন্দো মোন্ত্রো মোন্ত্রণা মোঙ্গল

যেখানে 'অ'-এর হসন্ত উচ্চারণ হবে

১। শেষ শব্দে 'অ' থাকলে এবং তুচ্ছার্থে ও সম্ভ্রমার্থে।	হাত ভাত কর চলুন নয়ন অবকাশ পরিহাস	হাত্ ভাত্ কর্ চলুন্ নয়ন্ অবকাশ্ পরিহাস্
২। 'ত' শব্দ বিশেষ্য হলে।	গীত মত কাত	গীত্ মত্ (Opinion) কাত্

আ-এর দু'রকম উচ্চারণ

হ্রস্ব	উদাহরণ	দীর্ঘ	উদাহরণ
একাক্ষর পদ না হলে হ্রস্ব উচ্চারণ হবে।	আপন, কাপড়, বাড়ি, পাতি	একাক্ষর পদ হলে দীর্ঘ উচ্চারণ হবে।	আ-জ, ভা-ত, রা-ত, না—

ই ও ঈ-র দু'রকম উচ্চারণ

হ্রস্ব	উদাহরণ	দীর্ঘ	উদাহরণ
একাক্ষর পদ না হলে হ্রস্ব উচ্চারণ হবে।	দীনতা	একাক্ষর পদ হলে উচ্চারণ দীর্ঘ হবে।	দী—ন বা দি—ন

উ ও ঊ-র দু'রকম উচ্চারণ

উদাহরণ			উদাহরণ	
ঊ-র মত উচ্চারণ	উচ্চারণ	'ও'র মত উচ্চারণ। দ্ব্যক্ষর শব্দে 'উ' 'অ' বা 'আ' থাকলে 'ও'-র মত উচ্চারণ হয়।	শব্দ	উচ্চারণ
			উঠ	ওঠ
			উড়া	ওড়া

ঋ-কারের উচ্চারণ 'রি'-র মত

শব্দ	উচ্চারণ
ঋষি	রিষি
ঋতু	রিতু
বৃষ	ব্রিষ
কৃষ্ণ	ক্রিশ্নো
অমৃত	অম্রিতো
ঘৃত	ঘ্রিতো

'এ'-র দু'রকম উচ্চারণ

'এ'র মত উচ্চারণ		'এ্যা'র মত উচ্চারণ
১)	ছেলে, মেয়ে, একটি, দেশ, বেশ	১) এক (এ্যাক), কেন (ক্যানো) খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা) একা (এ্যাকা)
২) পরে ই-কার বা উ-কার থাকলে	জেঠি, বেটী, কেলী তেলী, কেতু, সেতু	২) একাক্ষর শব্দের শেষের শব্দটি ক,খ,চ,ড়,ন,ণ,য় হলে 'এ্যার' মত উচ্চারণ হবে, উদাহরণ—বেঙ (ব্যাঙ), নেয় (ন্যায়), দেখ (দ্যাখ)

'ঐ' ও 'ঔ'-এর উচ্চারণ

'ঐ'এর উচ্চারণ 'ওই' এবং 'ঔ'এর উচ্চারণ 'ওউ' হয়	উদাহরণ	
	ঐক্য	ওইককো
	চৈতন্য	চোইতোন্‌নো
	গৌরব	গোউরব
	দৌড়	দোউড়

'ও' কারের দু'রকম উচ্চারণ

হ্রস্ব	দীর্ঘ
রোগা	রো—গ
যোগী	যো—গ
ভোলা	ভো—ল

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

(ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ং ঃ ঁ)

'ক' থেকে 'ম' এই ২৫টি ব্যঞ্জনবর্ণকে বলে স্পর্শবর্ণ, কারণ এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় জিভ গলা তালু মূর্ধ, বা তালুর মধ্যভাগ, ঠোঁট ও দাঁত স্পর্শ করে।

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান
১। ক খ গ ঘ ঙ	গলা
২। চ ছ জ ঝ ঞ	তালু
৩। ট ঠ ড ঢ ণ	মূর্ধা বা তালুর মধ্যভাগ
৪। ত থ দ ধ ন	দাঁত
৫। প ফ ব ভ ম	ঠোঁট

২৫টি স্পর্শবর্ণের মধ্যে ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচটি 'নাসিক্য বর্ণ', কারণ এদের উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয়। চন্দ্রবিন্দু ও অনুস্বারকেও 'নাসিক্য বর্ণ'-র মধ্যে ফেলা যায়। যেমন, বাংলা—বাঙলা, রং—রঙ।

শ ষ স হ—এই চারটি 'উষ্ম' বা 'শ্বাস বর্ণ', যতক্ষণ শ্বাস থাকে এই বর্ণগুলোকে প্রলম্বিত করা যায়।

য র ল ব — এই চারটি 'অন্তঃস্থবর্ণ'। এরা স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তরে বা মাঝে বসে।

বিসর্গ-র উচ্চারণ শুধুমাত্র বিস্ময়সূচক অব্যয়েই প্রকাশ পায়। যেমন, আঃ, উঃ, ওঃ ইত্যাদি। পদের মধ্যে থাকলে পরের বর্ণটি দ্বিত্ব হয়। যেমন, দুঃখ—দুক্‌খ, নিঃসঙ্গ—নিস্‌সঙ্গ, অতঃপর—অতপ্‌পর, নিঃশেষ—নিশ্‌শেষ।

উপরের এই দুটো জায়গা ছাড়া বিসর্গ-র কোনো উচ্চারণ নেই। যেমন, বিশেষতঃ—বিশেষতো।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ দু'রকম

১) অল্পপ্রাণ—উচ্চারণে অল্প বাতাস বের হয়।
   ক গ চ জ ট ড় ত দ প ব—এই দশটি অল্পপ্রাণবর্ণ।

২) মহাপ্রাণবর্ণ—উচ্চারণে বাতাস জোরে বের হয়।
   খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ ঘ ধ ফ ভ—এই দশটি মহাপ্রাণবর্ণ।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণের ধ্বনি-বিজ্ঞানটি মেনে না চললে

১) 'কখন' শোনা যাবে 'ককন'

২) 'যখন' হবে 'যকন'

৩) 'ঝঞ্ঝা' হবে 'জন্জা'

৪) 'ঘণ্টা' হয়ে যাবে 'গণ্টা'

৫) 'যাচ্ছি' বদলে হবে 'যাচ্চি'

৬) 'বাঘ' হবে 'বাগ'

৭) 'মুখ'-এর 'খ' দখল করবে 'ক'

৮) 'ব্যথা' 'ব্যতা'-তে পরিণত হবে

৯) 'কথিত'-র পরিবর্তে শোনা যাবে 'কতিত'

১০) 'দুঃখিত' না হয়ে হবে 'দুক্কিত'

ঙ ঞ ণ ন ম ং ও ঁ বর্ণের উচ্চারণ

নাসিক্য বর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ না হলে শব্দের অর্থটিই পাল্টে যায়। যেমন,

১) 'কাঁদা'—'কাদা' হয়ে যায়

২) 'বাস' হয়ে যায় 'বাঁশ'

৩) 'কুঁড়ি'-কে বেমালুম 'কুড়ি' বানিয়ে ফেলা হয়

৪) 'বাধা' 'বাঁধা'-তে আটকে পড়ে

৫) 'গোঁড়া' থেকে 'গোড়া' ও 'চাঁদ' থেকে 'চাদ' হয়

৬) 'ছাঁদ'—'ছাদ' হয়ে উঠে

৭) 'শাঁখা' বৃক্ষের 'শাখা'-য় রূপান্তরিত হয়ে যায়

সব নাসিক্য বর্ণের উচ্চারণও এক নয়। ঁ ং ও ঙ-র উচ্চারণে নাক দিয়ে বাতাস বেশী বের হয় এবং ণ ন ও ম-র উচ্চারণ সামান্য অনুনাসিক হলে মিষ্টি শোনায়। যেমন,

"মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে
যার চোখ তাকে আর মনে পড়ে না"—

'উঁকি'-র ঁ-তে বাতাসের যা চাপ পড়বে, অন্যান্য 'ম' ও 'ন'-তে নিশ্চয়ই তা হবে না। প্রায়শঃই একটি নাসিক্য বর্ণের উচ্চারণের সময় অতিরিক্ত সচেতনতার দরুণ পরের বর্ণটিও সংক্রামিত হয়। যেমন,

১) 'তাঁহারা' হয়ে যায় তাঁহাঁরা

২) 'চাঁদ'—চাঁদঁ বা 'অনন্ত'—অঁনন্ত হয়ে পড়ে

এই ত্রুটি কাটিয়ে ওঠার জন্য নীচের লাইনটি বার বার অভ্যাস করা যেতে পারে

"ষাঁড়ের গোবরে সার হয় না, কিন্তু বাঁশ দিয়ে বাসা তৈরী হয়।"

যুক্তাক্ষর 'জ্ঞ'-র উচ্চারণও নাসিক্য ধ্বনির মত হবে। যেমন, আজ্ঞা—আগগাঁ, দৈবজ্ঞ—দৈবগগোঁ, জ্ঞানী—গ্যাঁনী, যজ্ঞ—যগগোঁ। অজ্ঞ, জ্ঞাতি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি এজাতীয় শব্দের আরো কিছু উদাহরণ।

অনুশীলনী

১। বাধা—বাঁধা, গাদা—গাঁদা, হাড়ি—হাঁড়ি, ফোটা—ফোঁটা, চাই—চাঁই, দাড়ি—দাঁড়ি, খাড়া—খাঁড়া, বা—বাঁ, ঘাট—ঘাঁট, পাক—পাঁক।

২। "নদীর নাম সই অঞ্জনা,
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখী লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখবে না বাকী" (নজরুল ইসলাম)

৩। প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি,
খাসা তোর চ্যাঁচানি।
শুনে শুনে আনমন
নাচে মোর প্রাণমন।
মাজা গলা চাঁচা সুর
আহ্লাদে ভরপুর।
গলা চেরা গমকে
গাছপালা চমকে।
সুরে সুরে কত প্যাঁচ
গিটকিরি ক্যাঁচ ক্যাঁচ।" (সুকুমার রায়)

৪। না-সাদা, না-কাল, না-টক, না-মিষ্ট, না-ভাল, না-মন্দ, না-ঝাল, না-অম্বল।

৫। "পাঁচ পাঁচটা টাকা দিয়ে বাঁশেরগাঁও থেকে
চাঁদা তুলে হাঁস কিনেছি ভাই
পাঁচ বাঁচিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে
আঁক কষবো বলে
আঁখির জলে ধুইয়ে দিলাম তাই।"

শ ষ ও স-র উচ্চারণ

এই তিনটি বর্ণের ভুল উচ্চারণে কি মারাত্মক ফল হতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হ'ল ঃ

Sান্তি (শান্তি), Sপ্ন (স্বপ্ন), Sাধনা (সাধনা), Sত্য (সত্য), Sিব (শিব), অSিথির (অস্থির), ব্যShতো (ব্যস্ত), অSান্ত (অশান্ত), অSভ্য (অসভ্য), Sুন্দর (সুন্দর), Sুশান্ত (সুশান্ত), SমোShতো (সমস্ত), Shীরামপুর (শ্রীরামপুর), Shনান (স্নান), Sুস্থ (সুস্থ), Shৃষ্টি (সৃষ্টি), Sনখা (সংখ্যা), রS (রস), SাSSত (শ্বাশ্বত), Sিক্ষা (শিক্ষা), SিSির (শিশির), Sম্ভু (শম্ভু)

এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ দু'রকম—

১) ইংরাজী 'Sh'-এর মত।

২) এই বর্ণগুলোর সঙ্গে 'র-ফলা', 'ঋ-ফলা' এবং ক খ ত থ প ফ ন ল ও ইংরাজী শব্দের 't' যুক্ত হলে 'S'-এর মত উচ্চারণ হবে।

উদাহরণ

ইংরাজী 'Sh'-এর মত	ইংরাজী 'S'-এর মত
কষ্ট, সব, শব, সত্য, শষ্য, সজীব, সন্তান, শান্তি, সাধনা, স্বপ্ন, অশান্ত, সংখ্যা, রস, শ্বাশ্বত, শক্তি, বৃষ্টি, সুস্থ, সুন্দর, শিব, সমস্ত, শিশির, শিক্ষা, আষাঢ়, সংগ্রাম,	১। র-ফলা—শ্রবণ, শ্রী, শ্রাবণ, স্রষ্টা, শ্রদ্ধা, শ্রমিক ২। ঋ-ফলা—শৃগাল, শৃঙ্খল, স্মৃতি, কৃষক, দৃষ্টি ৩। 'ক'—স্কন্ধ, স্কন্দ, স্কলার, স্কুল

ইংরাজী 'Sh'-এর মত	ইংরাজী 'S-এর' মত
সংগ্রহ, সংজ্ঞা, সংবাদ, নষ্ট, শাবাশ, শরাব, সাবধান, সাফল্য, স্বাস্থ্য, স্বার্থ, স্বীকার, শ্মশান, শোষক, শোষিত, শোভন, শিবির, শোকোচ্ছ্বাস, শীর্ষ, মণীষা, ষড়যন্ত্র, ষড়ানন, ষষ্ঠ, ষষ্ঠীতলা, ষোড়শ, ষাঁড়, সন্ত্রাস, শিকার	৪। 'খ'—স্খলন, স্খালন
	৫। 'ত'—ব্যাপ্ত, সমস্ত, স্তবক, স্তব্ধ, স্তূপ
	৬। 'থ'—অস্থির, সুস্থির, স্থাপত্য, স্থগিত, স্থান
	৭। 'প'—স্পন্দন, স্পিরিট, স্পর্ধা, ব্যতিক্রম ঃ 'ষ' থাকলে হবে না। যেমন, পুষ্প, নিষ্পাপ, নিষ্পন্দ
	৮। 'ফ'—স্ফটিক, স্ফীত, স্ফুলিঙ্গ
	৯। 'ন'—স্নান, স্নিগ্ধ, স্নেহ, স্নায়ু
	১০। 'ল'—অশ্লীল, শ্লথ, স্লেট
	১১। 'ট'—ষ্টিমার, ষ্ট্যাম্প, ষ্টেশন

১। শ্লেষ্মা S Sh	২। সুস্থ Sh S	৩। সমস্ত Sh S	৪। শ্রীশ S Sh	৫। শ্মশ্রু Sh S	৬। সৃষ্টি S Sh
৭। সস্ত্রীক Sh S	৮। সস্তা Sh S	৯। সশস্ত্র Sh Sh S	১০। সস্নেহ Sh S	১১। সহস্র Sh S	
১২। সুস্পষ্ট ShSSh	১৩। স্পর্শ S Sh	১৪। স্পষ্ট S Sh	১৫। স্বস্তি ShS		

'Sh' উচ্চারণের সময় জিভের মধ্যভাগ কঠিন তালুকে স্পর্শ করবে ও 'S' উচ্চারণের সময় জিভের ডগাটি দাঁত স্পর্শ করবে। 'Sh-অ', 'S-অ', 'Sh-অ'—'S-অ', 'Sh-অ', 'S-অ'—এমনি করে যতবার পারেন জিভের ডগাটিকে ব্যবহার করুন, ভালো ফল পাবেন। যাঁদের মধ্যে 'স' জাতীয় রোগ বহুদিন বাসা বেঁধে রয়েছে, তাঁরা নীচের অনুশীলনীগুলো রোজ অভ্যাস করতে পারেন ঃ

১) She is seeing ships sitting on the sea shore.

২) শ্যামবাজারের অসুস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশ সত্য শর্মা বৃষ্টির মধ্যে ব্যস্ত সমস্ত
Sh Sh S S S Sh Sh Sh Sh S Sh S

হয়ে খুব কষ্ট করে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে শহীদমিনারের পাদদেশে সি-পি-
Sh S S Sh Sh Sh S

এম-এর বিশাল সমাবেশে সশরীরে উপস্থিত হলেন।
Sh Sh ShSh S

৩) সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল সৈন্যসহ সেলুকস বিশৃঙ্খল শত্রুসৈন্যদের সম্পূর্ণ পরাস্ত
ShSh ShS Sh Sh S S S Sh Sh Sh S

করে নিজের সাম্রাজ্যে ফিরে এলেন।
Sh

'র' ও 'ড়'-এর উচ্চারণ

'কাতাড়ে কাতাড়ে সৈন্য ফেড়ে চাড়িধাড়ে' বা 'দেশে দেশে মোড় ঘড় আছে' বা 'হাজাড় বছড়েড় ভ্রমভুলে, বিদ্রোহ কড়, নাড়ীজাতিড় মুক্তিড় জন্য বিদ্রোহ কড়'— 'র'-এর উচ্চারণ 'ড়'-এর মত হলে সংলাপগুলোর অবস্থা এইরকমই দাঁড়ায়।

'ড়'-এর স্থানে 'র' বা 'র'-এর স্থানে 'ড়' উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের অর্থে বিপর্যয় ঘটাতে বাধ্য। যেমন—

১। বড়—বর ২। ধড়—ধর ৩। চড়—চর ৪। মড়া—মরা ৫। বাড়ি—বারি ৬। মাড়ি—মারি ৭। তাড়া—তারা ৮। মাড়—মার ৯। হাড়—হার ১০। চুড়ি—চুরি ১১। ঘোড়া—ঘোরা ১২। ছাড়—ছার ১৩। পড়া—পরা ১৪। সাড়া—সারা ১৫। জোড়—জোর ১৬। আমড়া—আমরা ১৭। ঝড়—ঝর।

ত্রুটি সংশোধন

জিভের অবস্থান অনুযায়ী 'র' 'ড়' র' 'ড়' 'র' 'ড়' আবার বিপরীতভাবে 'ড়' 'র' এই ভাবে ধীরে ধীরে খুব সচেতনভাবে উচ্চারণ অভ্যাস করুন। যাঁদের এই 'র' উচ্চারণে ত্রুটি আছে তাঁদের এই অনুশীলন বহুদিন চালিয়ে যেতে হবে। সচেতনভাবে বহুদিন অভ্যাস করার পর গতি বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন। একসময় দেখবেন আর সচেতনভাবে বলার প্রয়োজন হচ্ছে না। এই

ব্যায়ামের সাথে সাথে যদি নীচের অংশগুলো রোজ পড়ার অভ্যাস করেন তা'হলে ত্রুটি সংশোধনের পথে কতটা এগোলেন বুঝতে পারবেন।

১। জঙ্গলের মধ্যে যদিও সুরক্ষিত ঘর তবুও বাঘের ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনলে ভয় করে।

২। 'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙ্গেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবন মরণে
কথনো ভুলতে পারি?' — সুকান্ত ভট্টাচার্য

৩। 'বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?
এস তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক।
উঠুক তুফানে মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছোক দ্বারে
ভীরুরা থাক্।
মানব না বাধা, মানব না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি
সাধ্য কার?
রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন?
চোখ রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারি না ধার।
খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা সে বিদ্রোহ গড়ি
ছিঁড়ি দুহাতের শৃঙ্খল দড়ি
মৃত্যুপণ।

দিক্‌ থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্বকোণ।
ছিঁড়ি, গোলামির দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি
খুঁজি কোনখানে স্বর্গের সিঁড়ি
কোথায় প্রাণ।
দেখব, ওপরে আজো আছে কারা
খসাব আঘাতে আকাশের তারা
সারা দুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া,
ছড়াব ধান।
জানি রক্তের পিছনে ডাকবে সুখের বান।' —সুকান্ত ভট্টাচার্য

র-ফলা (্র), রেফ (র্) ও ঋ-ফলার (ৃ) উচ্চারণ

উচ্চারণে এই বর্ণগুলো বাদ পড়ে যাবার জন্য সংলাপ কিরকম শোনা যায় তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হ'ল ঃ

১) আজ আমার পোনতি গোহন করো পিথিবী।

২) শোমিক শেণীর স্বাথ্যে শোমিক সমাবেশে বোক্তিতা হচ্ছে।

৩) শোষনের কল বিকল কত্তে বিদ্যোহ কর। শোমিক কিষকের রাজ গড়তে বিদ্যোহ কর। নতুন সমাজ গত্তে একযোগে বিদ্যোহ কর।

৪) পোতিবাদ জানিয়ে লাভ কি ? তার আগেই তো মিথ্যে পোতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

৫) মিত্যুরে লব অম্‌মিত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

৬) পোতিযোগিতা, পোতিকিয়াশীল, আবিবিত্ত, পেম, শেনী-সংগাম, মিণালিনী, শীকিষ্ণ, পোগ্যাম, পোকিতি, পেক্ষাগিহ, দিষ্টি, পোশ্যয়, পোহরী, পাণ, পোস্থান, পোবেশ, দিশ্য, পোমোদ, কীরা, পাকিতিক, ক্ষুদ্দ, গাহ্য, ভোমোন, বাম্‌ভন, সুশিংখল, পোন্য, দোপদী, বষ্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ত্রুটি সংশোধনের অনুশীলনী

১) যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

২) হে সূর্য ! শীতের সূর্য । হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত, তোমার প্রতীক্ষায় আমরা থাকি । যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ, ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে ।

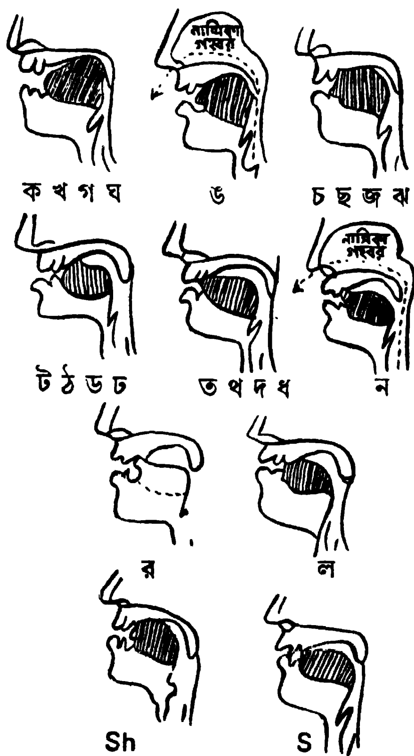
— সুকান্ত ভট্টাচার্য

ম ল হ ব ক্ষ র ঞ — এই ৭টি বর্ণের বিশেষ উচ্চারণ

বর্ণ	সূত্র	উদাহরণ	
		শব্দের বানান	শব্দের উচ্চারণ
ম	১) যখন অন্য বর্ণের সঙ্গে মিলে ম-ফলা হয়, তখন শব্দের প্রথমে অনুচ্চারিত থাকে ।	শ্মশান	শশান
	২) যখন মাঝে বা শেষে থাকে তখন যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার দ্বিত্ব হয় ।	লক্ষ্মী পদ্ম	লোখ্‌খী পদ্দো
	৩) কোথাও কোথাও একটি অনুনাসিক ধ্বনি থাকে ।	মহাত্মা ভীষ্ম	মহাত্তঁা ভীশ্‌শেঁা
ল	১) ল-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হয় ।	বিপ্লব অম্ল	বিপ্‌প্লব অম্‌ম্লো
হ	১) য-ফলার সঙ্গে যুক্ত হলে 'জ্ঝ'-র মত উচ্চারিত হয় ।	বাহ্য সহ্য	বাজ্‌ঝো সোজ্‌ঝো

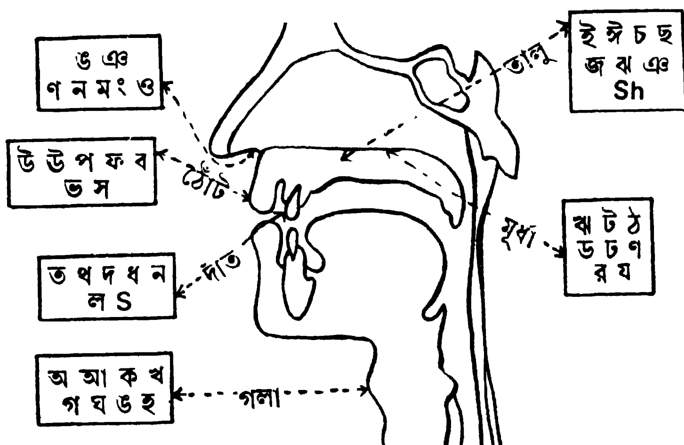
বর্ণ	সূত্র	উদাহরণ	
		শব্দের বানান	শব্দের উচ্চারণ
ব	১) কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গঠন করলে, উচ্চারণ হয় না—শুধু আগের ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়।	অন্বয় সত্ত্বর ঈশ্বর	অন্‌নয় সত্‌তর ঈশ্‌শর
	২) প্রথম অক্ষরে থাকলে উচ্চারণ হয় না।	দ্বিত্ব স্বত্ব	দিত্‌তো সত্‌তো
	৩) কয়েকটি সংযুক্ত বর্ণেতে 'W'-র মত উচ্চারণ হয়।	জিহ্বা আহ্বান বিহ্বল	জিউহা আওহান্ বিউহল্
ক্ষ	১) 'খ' বা 'কখ'-এর মত উচ্চারণ হয়।	লক্ষ কক্ষ	লোক্‌খো কোক্‌খো
	২) শব্দের প্রথমে থাকলে 'খ'-এর মত উচ্চারণ হয়।	ক্ষণিক ক্ষমতা	খোনিক খমোতা
র	১) র-ফলা যোগে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়।	বিক্রয় নম্র	বিক্‌ক্রয় নম্‌ম্রো
ঞ	১) এই বর্ণের উচ্চারণ এখন 'ন'-এর মত।	অঞ্জন	অন্‌জোন্
	২) অন্যত্র 'য়'-র মত	মিঞা	মিয়াঁ

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে জিভের অবস্থান



বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থান

বর্ণ		উচ্চারণ স্থান
১	অ আ ক খ গ ঘ ঙ হ	গলা
২	ই ঈ চ ছ ঝ ঞ Sh	তালু
৩	ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র য	মূর্ধা বা তালুর মধ্যভাগ
৪	ত থ দ ধ ন ল ৎ S	দাঁত
৫	উ ঊ প ফ ব ভ ম	ঠোঁট
৬	এ ঐ	গলা ও তালু
৭	ও ঔ	গলা ও ঠোঁট
৮	ব	দাঁত ও ঠোঁট
৯	ঙ ণ ন ম ঞ্জ ং ঁ	নাক



ধ্বনি বিপর্যয়

একই শব্দ পর পর থাকলে বা যুক্তাক্ষর হলে উচ্চারণ করতে খুবই অসুবিধা হয়, বলতে গেলে আটকে যায়। অনেকের আবার এসব ক্ষেত্রে আগের ধ্বনি পরে বা পরের ধ্বনি আগে চলে আসে। যেমন 'লেনিন' হয় 'লেলিন' বা 'পিশাচ' হয় 'পিচাশ', 'রিক্সা' হয় 'রিস্কা', 'বাক্স' হয় 'বাস্ক'।

অভ্যাসের জন্য কয়েকটি ধ্বনি-বিপর্যয়-এর অনুশীলনী দেয়া হ'ল ঃ

১। সৌভ্রাতৃত্ব ২। বিস্রস্ত ৩। আনৃন্য ৪। প্রশস্ত
৫। Blue blood, bad blood, bloody blood, bustard blood,
৬। পাখী পাকা পেঁপে খায় ৭। ধর যদি অভিনয় অভিযান হয় তবে কেন অকারণ অসমান অসফল হয় ৮। অনুরণন ৯। কক্ষ ১০। গগন ১১। চাঁচর ১২। জারজ ১৩। জ্বলজ্বল ১৪। ততক্ষণ ১৫। ততোধিক ১৬। তড়িঘড়ি ১৭। তদতিরিক্ত ১৮। দলাদলি ১৯। দশানন ২০। দাউদাউ ২১। নন্দিনী ২২। নন্দন ২৩। গণনাট্য ২৪। নাকানি-চোবানি ২৫। পাপাচার ২৬। পাপড়ি ২৭। পাপিষ্ঠ ২৮। ফুরফুর ২৯। বর্ণনা ৩০। বাছবিচার ৩১। বিচিত্রবীর্য ৩২। বিবস্ত্র ৩৩। বিবশ ৩৪। বিবাদ ৩৫। মন্ত্রণা ৩৬। লটর-পটর ৩৭। সোনায় সোহাগা ৩৮। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা ৩৯। মাটির মানুষ ৪০। পুঁটি মাছের প্রাণ ৪১। কথার কথা ৪২। কথায় কথায় ৪৩। শ্রদ্ধাস্পদেষু ৪৪। কল্যাণীয়েষু ৪৫। মুমূর্ষ ৪৬। ঋণগ্রস্ত ৪৭। সুশ্রী ৪৮। অনির্বচণীয় ৪৯। উদ্ভিদ ৫০। সস্ত্রীক ৫১। অজাতশত্রু ৫২। নাতিশীতোষ্ণ ৫৩। "মরণ যখন অনিবার্যই, হাসিয়াই চলে যাই ; রক্ষক যেথা ভক্ষক, সেথা মরা সে ত বাঁচিয়াই" ৫৪। "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে" ৫৫। 'রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম, ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম। পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি', মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামি" ৫৬। "যথাসাধ্য ভালো বলে, ওগো আরো ভালো, কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাক আলো। আরো ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায় অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়" ৫৭। উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে' ৫৮। এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা' ৫৯। কাঁপিয়ে পাখা, নীল

পতাকা ছুটলো অলিকুল ৬০। 'মাতৃবক্ষস্থিত শিশুসন্তানের ন্যায় নদীগর্ভে নৌকারাজি হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ মালার সহিত খেলা করিতেছে' ৬১। দিগ্বিদিক্ ৬২। দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান ৬৩। স্বতঃপ্রবৃত্ত ৬৪। রক্ষণাবেক্ষণ ৬৫। উচ্চারণ ভেঙ্গে হয় মাত্রাভেদ ভ্রাতা, না হলে কলকাতা কেন হবে কল কাতা ? ৬৬। 'সূর্য ব্যাটা বুর্জোয়া যে দুর্যোধনের ভাই। গর্জনে তার তূর্য বাজে, তর্জনে ভয় পাই ৬৭। 'অসমতল অমসৃণ পন্থায় হেঁটে যাত্রীদের গিয়েছে সারা জীবন কেটে'।

বিশেষ কয়েকটি শব্দের ভুল উচ্চারণ

অবহেলা ও অমনোযোগের ফলে কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণে কি ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হ'ল ঃ

উদাহরণ

শব্দের বানান	ভুল উচ্চারণ
অমিত্রাক্ষর	অমৃতাক্ষর
✓সম্মান	সন্মান
বঙ্গোপসাগর	বঙ্গোপ্‌সাগর
অমৃত	অম্রিত
রজনীগন্ধা	রোজনীগন্ধা
অত্যাচার	অত্যোচার
পণ	পোণ
✓পিশাচ	পিচাশ
ঘনিষ্ঠ	ঘনিষ্ট
কৃত্রিম	কিত্রিম
✓শিরশ্ছেদ	শিরচ্ছেদ
মেঘনাদ	মেঘনাথ বা মেগনাদ
✓সম্মুখে	সন্মুখে

শব্দের বানান	ভুল উচ্চারণ
গৃহ	গ্রিহ
এসেছিল	এসেচিল
স্বাস্থ্য	স্বাস্ত্য
জ্যেষ্ঠ	জেষ্ট
মধুসূদন	মদুসূদন
পরোক্ষ	পরক্ষ
নামুন	নাবুন
মৃত্যু	মিত্যু
আচার্য	আচায্য
দ্যাখা	দ্যাকা
চিকিৎসা	চিকিস্‌সা
সম্মেলন	সন্মেলন
হাসি	হ'াসি
মুখ	মুক
ঠাকুর	থাকুর
হঠাৎ	হটাৎ
হুজুর	হুঁজুর

উচ্চারণের ত্রুটিগুলো সাধারণতঃ কি হয়ে থাকে ও কেন এই ত্রুটিগুলো ঘটে মোটামুটি এই ভাবে তা ভাগ করা যেতে পারে ঃ

ত্রুটি

১। শব্দের ভুল উচ্চারণ।

২। কথা খেয়ে ফেলা বা বাদ পড়ে যাওয়া।

৩। হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে পার্থক্য না করা

৪। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য না করা।

৫। 'শ', 'ষ', ও 'স'-র উচ্চারণে গণ্ডোগোল।

৬। 'র'-এর জায়গায় 'ড়' ও 'ড়'-এর জায়গায় 'র' উচ্চারণ।

৭। ঁ এবং ন, ণ, ম ইত্যাদি নাসিক্য বর্ণের উচ্চারণ না হওয়া।

৮। 'র-ফলা' (্র) 'রেফ' (র্) ও 'ঋ-কারের' (ৃ) উচ্চারণ না হওয়া।

৯। 'অ'-র সঠিক উচ্চারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

১০। অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন উচ্চারণ।

১১। চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণের অভ্যাস।

১২। অতিদ্রুত ঝাঁকিপূর্ণ উচ্চারণ।

১৩। নাসিক্য ধ্বনির প্রাবল্য।

১৪। দন্তমূলীয় উচ্চারণের পরিবর্তে ঠোঁট দুটো গোল করে ছোট করে বলার অভ্যাস।

১৫। বিশেষ কয়েকটি যুক্তাক্ষর উচ্চারণে অক্ষমতা।

কেন এই ত্রুটি

১। অসাবধানতা, অমনোযোগ ও অবহেলা।

২। জিভের জড়তা। জিভ ও ঠোঁটের অসতর্ক ব্যবহার।

৩। অলস ও মোটা ঠোঁট বা উপরের শক্ত ঠোঁট।

৪। দ্রুত গতিতে কথা বলার অভ্যাস।

৫। অনেক সময় অলস ঠোঁট ও দ্রুত গতিতে বা ধীর গতিতে কথা বলা একই সঙ্গে ঘটে।

৬। নকল দাঁত।

৭। মুখের 'হাঁ' অস্বাভাবিক রকম ছোট।

৮। অজ্ঞতা ঃ

ক) অভিধানের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

খ) সঠিক উচ্চারণ জানেন না।

গ) ত্রুটি কোথায় জানেন না।

ঘ) আঞ্চলিক প্রভাব।

৯। চোয়াল শক্ত করে কথা বললে বা চোয়ালে কাঠিন্য থাকলে ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ হতে বাধ্য।

১০। জিভ যদি ঠিকমত কাজ না করে, পেছন দিকে জোর করে ঠেলে দেয়া হয় ও জিভের ডগাটি নরম তালুর উপর স্পর্শ করে তবে বাতাসের স্রোত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে বেরোতে পারে না। ফলে 'ট' বর্ণটি 'ড'-র মত শোনায়।

১১। ভুল শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, গলা ও চোয়ালের মাংসপেশীর কাঠিন্য এবং জিভের ব্যবহার না হওয়াই স্বরবর্ণের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের কারণ।

১২। জিভের ডগার সঠিক অবস্থান, প্রবল সক্রিয়তা ও কর্মশক্তির অভাবই ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের কারণ।

১৩। সঠিক ঘর্ষণ ও কম্পনের অভাব।

১৪। পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল।

সমাধান

১) বাচনভঙ্গির সিংহভাগই নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হতে হতে একটি বিশেষ বাচনভঙ্গি আমরা রপ্ত করে ফেলি। এই যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত কথা বলার একটি অভ্যাস তৈরী করে ফেলেছি, যার ফলে স্বরবর্ণগুলো বাদ পড়ে যাচ্ছে, ব্যঞ্জনবর্ণের অস্পষ্ট উচ্চারণ ঘটছে হামেশাই, সব কিছুর আগে দরকার এই গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রথমেই দ্রুতগতিতে কথা বলার অভ্যাসটি যদি পালটে ফেলতে পারেন, এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে নজর রাখতে পারেন, তাহলে বাচনভঙ্গির মধ্যে যে একটি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধে হবে না।

২) অভিনয় ও রিহার্সালের সময় একরকম উচ্চারণ আর আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে অন্যরকম উচ্চারণ করবেন না। কিছু সময় খুঁড়িয়ে

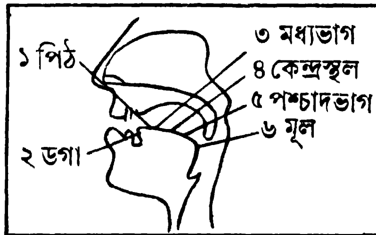
ও কিছু সময় স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন, অথচ হাঁটার প্রতিযোগিতায় জিতে যাবেন, এমন শারীরিক অবস্থা আশা করতে পারেন কি ? ঠিক তেমনি, কিছু সময় শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করবেন আর বাকী সময় অশুদ্ধ ও অমার্জিত উচ্চারণ করবেন, তা হতে পারে না। রিহার্সালে বা অনুশীলনের সময় যে শুদ্ধ উচ্চারণ রপ্ত করলেন, তা যদি সবসময় সর্বত্র ব্যবহার করার চেষ্টা না করেন, তবে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য, প্রায়ই আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হতে পারে।

৩) জিভ, চোয়াল ও ঠোঁট—উচ্চারণের এই যন্ত্রগুলো সক্রিয় করে তুলতে হবে। সামান্য কয়েকটি ব্যায়াম ও প্রতিদিন কয়েক মিনিটের অনুশীলনই এর জন্য যথেষ্ট।

জিভ আর ঠোঁটের মাংসপেশীগুলো যদি বশ্যতা মানে, জিভটিকে যদি ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ করে তোলা যায়, চোয়ালটি যদি স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করে, তবে স্পষ্ট উচ্চারণে কোন বাধা হবে না।

জিভ

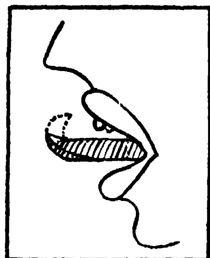
স্পষ্ট উচ্চারণে জিভের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এর অগ্রভাগ বা ডগাটি যত বলিষ্ঠ ও ধারাল হবে, উচ্চারণ তত ভাল হবে।

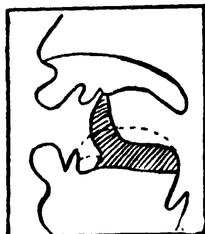


জিভের ব্যায়াম

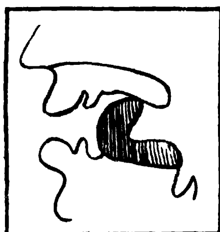
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরপৃষ্ঠায় উল্লেখিত ব্যায়ামগুলো করবেন। নিয়মিত ধৈর্য ধরে অভ্যাস করলে জিভের জড়তা কেটে যাবে, জিভ নমনীয় ও বলিষ্ঠ হবে।

১) জিভটিকে সমতল অবস্থায় রেখে মুখের বাইরে যতটুকু সম্ভব বের করে আনুন। এবার জিভের ডগাটিকে উপরের দিকে তুলুন ও ধীরে ধীরে পেছনের দিকে বাঁকাবার চেষ্টা করুন। জিভটি যেন ভেতরের দিকে চলে না যায়। এই ব্যায়ামটি করতে গেলে মনে হতে পারে, জিভটি বোধহয় বাঁকানো অসম্ভব। কিন্তু কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলেই দেখবেন খুব সহজেই জিভের ডগাটিকে বাঁকাতে পারছেন।





২) জিভের ডগাটি লম্বালম্বি ও কোনাকুনিভাবে পর্যায়ক্রমে উপরের ও নীচের দাঁতে স্পর্শ করুন।

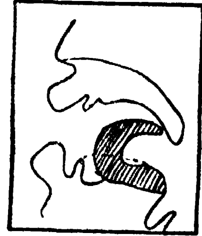


৩) যেন টন্‌সিল স্পর্শ করতে চাইছেন, এইভাবে জিভের ডগাটিকে পেছনের দিকে যতদূর সম্ভব নিয়ে যান।

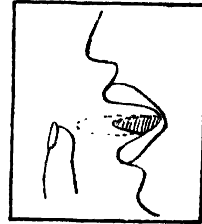


৪) জিভবে নীচের দাঁতের পাটির উপর দিয়ে ঠোঁটের ভেতর বেশ কয়েকবার জোরে চাপ দিতে থাকুন।

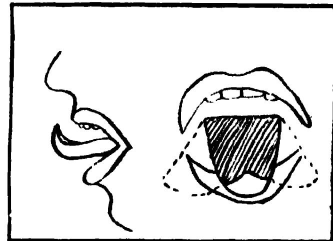
৫) 'ট' শব্দটি উচ্চারণ করার সময় জিভের ডগাটিকে শক্ত তালুর যেখানে আনার প্রয়োজন হয়, সেখানে আনুন। জিভের ডগাটিকে বাঁকিয়ে যথাসম্ভব পেছনের দিকে নিয়ে যান। যেন একটি বড় পাথরের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছেন এমনি ভাবে জিভের ডগাটি সামনের দিকে ছুঁড়ে দিন। ডগাটি যেন শক্ত থাকে। এ-ভাবেই জিভের সাহায্যে বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ করা হয়।



৬) একটি আঙ্গুল লম্বাভাবে মুখের দু' ইঞ্চি সামনে ধরুন। এবার মুখের ভেতর থেকে সমান্তরালভাবে জিভটিকে বের করে সেকেণ্ডে একবার করে আঙ্গুলটিতে লাগান। জিভটিকে পেছনের দিকে আনার সময় নীচের দাঁতগুলোর ভেতর দিক যেন স্পর্শ করে। এই ব্যায়ামটি প্রথমে ধীর গতিতে, পরে গতি বাড়িয়ে করবেন।



৭) প্রথম ব্যায়ামের মতই জিভটিকে সমতল অবস্থায় রেখে মুখের বাইরে আনুন। এবার জিভের ডগাটিকে উপরের দিকে তুলে রেখে ধীরে ধীরে একবার ডানদিকে ও একবার বাঁদিকে, এ-ভাবে অন্ততঃ ত্রিশ বার দোলান। জিভটি যেন আপনার ।ডানদিক বাঁদিক স্পর্শ করে।



৮) জিভকে মুখের ভেতরে ও বাইরে বৃত্তাকারে প্রথমে ধীর গতিতে ও পরে দ্রুত গতিতে ঘোরান।

৯) মুখের সামনে কোন খাবার এমন দূরত্বে রাখুন যাতে তার স্পর্শ পাবার জন্য জিভটিকে অনেকটা বাইরে আনতে হয়। এবার জিভটি দিয়ে খাদ্যদ্রব্যটি স্পর্শ করার চেষ্টা করুন।

১০) প্রথমে ধীরে ও পরে খুব তাড়াতাড়ি ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ ন র ল বলুন। বলার সময় ব্যঞ্জনবর্ণগুলো যেন জড়িয়ে না যায়। জিভের ডগাটি যেন শক্ত থাকে ও ঠিক জায়গায় ঠিকমত আঘাত করে।

১১) কুলের বিচি জিভের সাহায্যে কতদূর ছুঁড়তে পারেন, চেষ্টা করুন।

১২) জিভের ডগাটিকে শক্ত তালু ও উপরের দাঁতের উপর কাঁপিয়ে উচ্চারণ করুন। যেমন—(ক) প্র-র-র-র-র (খ) ট্রি-রি-রি-রি-রি (গ) তৃ-রি-রি-রি।

উপরের ব্যায়ামগুলোর পর জিভটি একটু ব্যথা হতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

ঠোঁট

ঠোঁট দু'টোকে ঘিরে রয়েছে একটি গোলাকৃতি মাংসপেশী যার সংকোচন ও সম্প্রসারণের সাহায্যে ঠোঁটদুটোকে নড়ান যায় ও বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণের জন্য অবস্থান ও আকৃতির পরিবর্তন করা যায়। নীচের ঠোঁটকে সহজেই নড়ান যায়। কিন্তু উপরের ঠোঁটকে ব্যায়ামের সাহায্যে নমনীয় করতে হয়। উপরের শক্ত ঠোঁট সঠিক উচ্চারণের এক নম্বর শত্রু। ঠোঁটদুটোর ধারগুলো যদি পেছনের দিকে টেনে সংলাপ বলেন তবে কণ্ঠস্বর পাতলা শোনাবে ও উচ্চারণে বিঘ্ন ঘটবে। নাকের ঠিক নীচ থেকে গালের শুরু পর্যন্ত অনেক ছোট ছোট মাংসপেশী আছে। পরিষ্কার ও সুন্দর উচ্চারণে এই মাংসপেশীগুলো সাহায্য করে, ভলিউমও বাড়ায়।

ঠোঁটের ব্যায়াম

১) উপরের ঠোঁটটি একবার উপরের দিকে ও একবার পেছন দিকে সম্প্রসারিত করুন। যদি স্বাভাবিকভাবে ঠোঁটটি না নড়ে তবে আঙ্গুল বা পেন্সিলের সাহায্য নিয়ে ব্যায়ামটি করবেন।

২) ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে অল্প ভিজিয়ে নিন। এবার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কাঁপিয়ে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে থাকুন। কিছুক্ষণ পর ভলিউমটি বাড়িয়ে দিন।

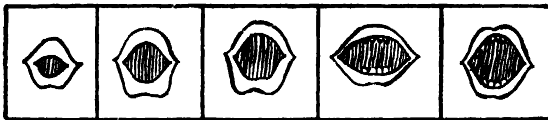
৩) ঠোঁটের পাশ দুটো সামনের দিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করুন যেন মনে হয় ঠোঁট ফোলাচ্ছেন।

৪) ঠোঁট দুটো দিয়ে ধীর গতিতে ভোমরার মত আওয়াজ তোলার চেষ্টা করুন। পরে গতি বাড়িয়ে দিন।

৫) খুব তাড়াতাড়ি বলুন 'পাখী পাকা পেঁপে খায়।'

৬) ঠোঁট দুটোকে সমতল ভাবে জোড়া লাগিয়ে চাপ দিন।

৭) ঠোঁট দুটোর সাহায্যে বিভিন্ন রকম আকৃতি তৈরী করুন। কোন সময় ঠোঁট দুটো খুলে ছোট, মাঝারি ও বড় বৃত্তের আকার সৃষ্টি করুন অথবা ঠোঁট সামনের দিকে নিয়ে এসে ছুঁচলো গঠন তৈরী করুন। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। ব্যায়ামের সুবিধার জন্য নীচে কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির ছবি দেয়া হ'ল।



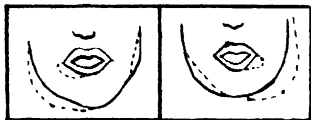
৮) ঘোড়ার মত ঠোঁট দুটো জোড়া করে, দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে জোরে বাতাস বের করে ঠোঁট দুটো দ্রুতগতিতে কাঁপান।

চোয়াল

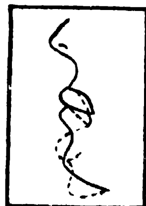
আমাদের চোয়ালের হাড়টি মুখের হাড়গুলোর সঙ্গে কব্জার মত আটকে আছে। মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে এটি বন্ধ হয়ে যায় ও সম্প্রসারণের ফলে নীচের দিকে ঝুলে যায়। চোয়ালের এই অনায়াস ঝুলে যাওয়াটিকেই কাজে লাগাতে হবে। সবরকম কাঠিন্য ও উত্তেজনা থেকেও চোয়ালটিকে

মুক্ত রাখতে হবে। খুব সহজেই যাতে মুখ থেকে শব্দ বের হয় তার জন্য চোয়ালটিকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। নীচের ব্যায়ামগুলো আয়নার সামনে প্রতিদিন অভ্যাস করুন—চোয়ালটি নমনীয় ও কর্মতৎপর হবে।

চোয়ালের ব্যায়াম



১) চোয়ালটিকে যতদূর সম্ভব ধীরে ধীরে একবার ডানদিকে ও একবার বাঁদিকে নিয়ে যান। হাতের আঙ্গুলগুলো চোয়ালের কব্জা ও চিবুকের উপর আলতো করে বোলান। এবার একটু তাড়াতাড়ি চোয়ালটিকে ডানদিক থেকে বাঁদিকে ও বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিয়ে যান। চোয়ালটিকে এভাবে নড়ানর মধ্যে যেন কাঠিন্য না থাকে। খুব সতর্ক থাকবেন যেন ঘাড়ের জায়গায় কোন রকম উত্তেজনা না থাকে।



২) চোয়ালটি ধীরে ধীরে উপরে ও নীচে সহজভাবে ওঠান ও নামান। কিছুক্ষণ পরে ওঠা ও নামার গতিটি বাড়িয়ে দিন। সমস্ত রকম উত্তেজনা পরিহার করবেন।

৩) শক্ত আপেল বা ডাঁসা পেয়ারা চিবোন! এই ব্যায়ামটি সত্যিকার বা কাল্পনিক বস্তুর সাহায্যেও করা যেতে পারে। যে ভাবেই করুন না কেন, ঠোঁট দুটো যেন খোলা অবস্থায় থাকে এবং জিভও বেশ সবলভাবেই নড়াচড়া করে।

৪) শিস্ দেয়াও চোয়ালের একটি ভাল ব্যায়াম। শিস্ দেয়ার সময় বাতাস খুব স্বচ্ছন্দভাবে বেরিয়ে আসে, চোয়াল নমনীয় অবস্থায় থাকে, গাল ও নাকের মাংসপেশীগুলো কাজ করতে থাকে।

৫) চোয়ালটি যতদূর সম্ভব নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখুন। এবার মাথাটিকে ধীরে ধীরে বাঁদিক থেকে ডান দিকে ও ডান দিক থেকে বাঁদিকে নিয়ে যান। কয়েক সেকেণ্ড এইভাবে করলে চোয়াল থেকে কাঠিন্য দূর হয়ে যাবে। আবার যখন চোয়ালটি উপরে তুলবেন, দেখবেন যেন চোয়ালটি চেপে বসে না থাকে।

আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ

অঞ্চলভেদে মৌখিক ভাষারও রূপভেদ আছে, আছে বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি। বীরভূম অঞ্চলের মানুষ যেভাবে উচ্চারণ করেন, বাঁকুড়ার মানুষ তা করেন না। দক্ষিন বাংলার কথ্য ভাষা আর খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলের কথ্যভাষার উচ্চারণবিধি এক নয়। পূর্ববঙ্গের মানুষ বাংলায় কথা বললেও পশ্চিমবঙ্গীয় মানুষের উচ্চারণবিধি থেকে তা স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গের মধ্যেও ঢাকার মানুষের কথা বলার সুরের সঙ্গে বরিশালের একেবারেই মিল নেই। কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষের কথা বলার ভঙ্গি চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের কথা বলার রীতি থেকে আলাদা।

আঞ্চলিক ভাষার এই উচ্চারণ শুধু ব্যাকরণ পড়ে, অপিনিহিতি বা অভিশ্রুতির নিয়ম মুখস্ত করলেই আয়ত্তে আনা যাবে না। যে অঞ্চলের ভাষা নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখে দেয়া আছে সেই অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশতে হবে, কান পেতে শুনতে হবে তাঁদের কথাবার্তার সুর ও ছন্দ, ঠোঁটের গোড়ায় তুলে নিতে হবে সেই ধ্বনিতত্ব; তবেই সম্ভব হবে সার্থক চরিত্রচিত্রণ। গানের বাণী ও স্বরলিপি মুখস্ত করে যেমন গান শেখা যায় না, দরকার হয় সুরের কান; উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই—দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ভাষার উচ্চারণের সুরটি কানে বাজা চাই। নীচে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মৌখিক ভাষার নিদর্শন দেয়া হল।

আদর্শ কথ্যভাষা

তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে বাড়ির কাছে যেম্‌নি পৌঁছুলো, ওম্‌নি নাচ গান বাজনার শব্দ শুন্‌তে পেলো। তখন সে একজন চাকরকে

ডেকে জিজ্ঞেস করল—এ সব ব্যাপার হচ্ছে কেন ? তাতে চাকরটি বল্‌ল-আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাবা তাঁকে ভালোয় ভালোয় ফিরে পেয়েছেন ব'লে নাচ-গান খাওয়ান দাওয়ান ক'র্‌ছেন।

ঢাকা (মানিকগঞ্জ)

তার বর ছাওয়াল তখন মাঠে আছিলো। সে বাড়ীর দিকে যতই আইগাইবার লাইগলো, ততই বাজনা আর নাচ শুইন্‌বার লাইগ্‌লো। তারপর একজন চাকররে ডাইকা জিগ্‌গাসা কৈল্লো—ইয়ার মানে কি ? সে কৈলো – তোমার বাই আইচে, তারে বা'লে বা'লে পাইয়া তোমার বাপে এক খাওন দিচেন।

চট্টগ্রাম

তার বড় পোয়া বিলৎ আছিল্‌। তে যয়ন্‌ ঘরর কাছে আইল, তয়ন্‌ নাচন্‌ বাজন্‌ হুনিল। তে তার একজন গাউর্‌রে ডাই জিগাইল যে, কি হইয়ে ? তে তারে কইল্‌—আঁওনার বাই আস্যে, আঁওনার বাবে তারে আরামে পাইয়ারে এক নিঅঁন্ত্রণ দিলে।

বরিশাল

হে কালে হের বর' পোলা কোলায় আছিল। হে বারীর কাছে যাইয়া বাজনা নাচনা হুনিতে পাইয়া একজন চাহর ডাকিয়া জিগাইল যে, এয়া কি ? হে কৈল তোমার বাই আইছে, আর তোমার বাপ মস্ত খানা জোগার হর্‌ছে, কারণ ছোট পোলা বা'ল বা'লাইতে পাইছে।

উত্তরবঙ্গ

তখন তার বড়ো বেঠা পাতার বাড়ীৎ আছিল্‌। পাছোৎ তাঁর আস্‌তে আস্‌তে বাড়ীর কাছোৎ যায়া নাচগানের শোর শুনবার পাইল্‌। তখন তাঁয় একজন চেঙ্গরাক্‌ ডাকেয়া পুছ করিল—ইগ্‌লা কি ? তখন তাঁয় তাক্‌ কইল—তোর ভাই আইচ্চে, তোর বাপ তাক্‌ ভালে ভালে পায়্যা একটা বড়ো ভাণ্ডরা করচে।

পুরুলিয়া-সিংভুম

ঐ লোকটার বড়ো বেটা তেখ্‌নে ক্ষেতে গেলছিলো, সে ফির্‌তি সময়ে যখ্‌নে আপনাদের ঘরের পাশে হাবড়ালো, তখনে লাচ বাজনার ধুম শুনতে পায়ে' একজন মুনিশকে বুলিয়ে পুছলেক্‌ যে—এসব কিসের লিয়ে হচ্ছে রে ? মুনিশটা বললেক— তুমার ভাই অ্যাইছেন্‌ ন, এহাতে তুমার বাপ কুটুম খাওয়াছেন, কেন্‌ন উহাকে ভালায় ভালায় পাওয়া গেল্‌ছে।

শ্রীহট্ট

হি সময় তার বর পুয়া ক্ষেতে আছিল। হে বারীর ধার, আইলে নাচ গাওনার শব্দ হুনল। হে একজন চাকররে ডাইক্যা জিঘাইল—এ হকল (ইতা) কিয়োর ? হে তা'রে কইল,—তুমার বাই বারীৎ আইছে, এর লাইগা তুমার বাপ বরখানি দিছইন্‌, কারণ তারে ভালা—আপ্তা ফির‍্যা পাইছইন্‌।

এবার আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ সুর সম্পর্কে একটা ধারণা উপস্থিত করছি।

খুলনা-যশোহর

'ত হোনে বড়ো ছল খাতিছিল ('চ' ও 'ছ'-র উচ্চারণ দন্তমূলীয় 'জ'-র মত) সে আসে (আইসের 'ই'-র স্বল্প উচ্চারণ হবে) বাড়ীর কাছে যেমনি পোঁছোনো, (চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ হবে না) অমনি নাচ গান বাজনা শব্দ শুনতি ('এ' কার 'ই' কার হয়ে যায়) পান। তহোনে একজন চাকররে ডাকে' জিজ্ঞাসা (নাসিক্য ধবনির উচ্চারণ নেই) কল্ল, "এসব ব্যাপার হচ্ছে ক্যানো।" তাতে চাকরডা ('ট' হয়ে যায় 'ড') কোলো আপনার ভাই ফিরে (ইংরাজি 'F' উচ্চারণের মত) আইছেন, আর আপনার বাবা তারে ভালয় ভালয় ফিরে পাইছেন বুলে ('ও'-কার 'উ'-কার হয়) নাচগান, খাওয়ান্‌ দাওয়ান্‌ করতিছেন।

অনুশীলনী

১। আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !
আমি মানি না ক' কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন !
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর !
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির।

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি' ।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ,
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল !
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা !
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির !

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম
- - - ভরপুর-মদ
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি !
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান !
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য ।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির !
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর.
বল বীর—
চির উন্নত মম শির !

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি বেদুঈন. আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ !
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র মহাশঙ্খ, আমি প্রণব নাদ-প্রচণ্ড !
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র শিষ্য,
আমি দাবানল দাহ, দহন করিব বিশ্ব
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস—আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস !
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী ।

আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্-দোল !—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি !
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ
আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়লাঞ্ছিত বুকে
গতি ফের।
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
চিত- চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ
কুমারীর।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক'রে দেখা অনুখণ,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন-কন্।

আমি চির শিশু, চির কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর !
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি !
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

[বিদ্রোহী—নজরুল ইসলাম]

২। 'স্বপ্ন দেখা ভুলেই গিয়েছিল গাঁয়ের লোক, এবার বন্ধ ডোবায়
ঢিল পড়েছে। কদিন ধরেই ঘুর ঘুর করছে শহুরে ছেলেটা—
কথাগুলো বেশ, নতুন আশায় দুলে ওঠে মন। কিন্তু না,
হুট বললেই হুট করা কি আমাদের সাজে? চলো সব নবীন
বুড়োর বাড়ি। সে বুঝদার লোক, কথার ওজন আছে। শাস্ত্রে বলে—
তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।
নবীন মাঝি মন দিয়ে শুনলো ওদের কথা। চোখ বুঁজে একবার
তার চারকুড়ি তিন বয়সের ঘানিটানা অতীত জীবনটা ঘুরে
এলো, তারপর ছানিপড়া চোখটা টানটান ক'রে যেন সামনে
বসা জোয়ানগুলোর আগামী দিনগুলোতে চোখবুলিয়ে নিয়ে
শুরু করলো—'শোন তবে বাছারা, সন্তান সম্ভবা হয় যখন
আমাদের মেয়েরা ন'মাসের সময় আমরা তাদের সাধ দিই,
তখন তাদের কি বলি জানিস? সামনের কদিন তোমাকে কত
কষ্ট কত যন্ত্রণা, কত রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যেতে হবে' যেগুলো
তোমার সহ্য করতে হবে সেই সুন্দর, উজ্জ্বল, ঝলমলে দিনটার
কথা মনে রেখে। যেদিন তুমি মা হবে, মা ব'লে ডাকবে তোমায়
তোমার সন্তান। মা ডাকের চেয়ে বড় ডাক মেয়েদের আর কি আছে!
একটু থেমে নবীন বুড়ো যোগ করলো—'আর তোরা তো জানিস,
বেশি বয়সে প্রসব হলে কষ্ট একটু বেশিই হবে।
দক্ষ ধানুকীর লক্ষ্যভেদ।
খুশির ঝিলিক খেলে গেলো উপস্থিত সবার চোখে
শক্ত হয়ে উঠলো হাতের পেশী—
উত্তর পেয়ে গেছে তারা।'

[নবীনমাঝি]

৩। 'সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ়নীল আকাশ পুড়িয়ে নিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণরাশি গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের

মত এর আকাশ ছেয়ে আসে ; আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদীতুষারমৌলি নীলহিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে। কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পর্বতসম মন্থর গমনে চলেছে ; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে আছে ; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে শূন্যপ্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য-গৌর, দীর্ঘকান্তিজাতি এইদেশ শাসন করছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস।'

[চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

৪। 'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা—
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্‌কা !
শাঁই শাঁই পন্ পন্ ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপধাপ—ওকি শুনি ভাই রে !
দেখছ না হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ চুপ ঐ শোন ! ঝুপ্ ঝাপ্ ঝ--পাস !
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ? গব্ গব্ গ—বাস !
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্, রাত কাটে ঐ রে !
দুড় দাড়্ চুরমার—ঘুমভাঙ্গে কই রে !
ঘর্ ঘর্ ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা !
কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিন্‌তা !
ঠুং ঠাং ঢং ঢং, কত ব্যাথা বাজে রে—
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে !
হৈ হৈ মার্ মার্ 'বাপ্ বাপ্' চিৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি ? সরে পড়্ এইবার।'

(শব্দকল্পদ্রুম—সুকুমার রায়)

৫। 'দূরে ঐ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্ন্যুদ্‌গারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব; ইতরপ্রকৃতি পাপীগণ তথায় বাস করে, আর সম্মুখে এই যে গগনচুম্বী তাম্রচূড়রক্তবর্ণ অলিন্দ পরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক। ...এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চছাদ, বাষ্পসঙ্কাকুল, গম্ভীর আকারে বিঘূর্ণিত। উভয় পার্শ্বে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে, তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প আর্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিংকরগণ ইন্দন নিক্ষেপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লীদ্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছে। ...এই যে রজতনির্মিত কিংকিনীজালমণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে নহুষ যযাতি দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পরিপক্ক হইতেছেন। ...ঐ যে বৈদূর্যখচিত হিরন্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তপ্ত তৈলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই কুম্ভ মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিপ্রয়োগে ইহার আদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ যে রুদ্রাক্ষমালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব দুর্বাসা কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিদ্ধ হইতেছেন।'

[জাবালি--রাজশেখর বসু]

৬। 'তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শতশত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।'

[মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত]

৭। 'ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন :
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল :
যেন ঊর্দ্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজী, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,—
শার্দ্দূল, ভল্লুক : বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিনী সুলোচনা,—
ফণিনী মনিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিঃশ্বাস ছাড়েন যেন সর্বনাশকারী !
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলের অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতনাথ সঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।

এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি ? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে !—

[তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত]

৮। 'অধর নিস্‌পিস্
নধর কিস্‌মিস্
রাতুল তুল্‌তুল্ কপোল
ঝরলো ফুল-কুল,
করলো গুলভুল
বাতুল বুলবুল চপল।
নাসায় তিলফুল
হাসায় বিল্‌কুল,
নয়ান ছল ছল উদাস,
দৃষ্টি চোর-চোর
মিষ্টি ঘোর ঘোর,
বয়ান ঢল্ ঢল্ হুতাশ !

অলক দুল্ দুল্,
পলক ঢুল্ ঢুল্,
নোলক চুম খায় মুখেই,
সিঁদুর মুখটুক,
হিঙুল টুক্টুক্
দোলক ঘুম যায় বুকেই।
ললাট ঝল্মল
মলাট মল্মল
টিপ্‌টি টল্‌টল সিঁথির,
ভুরুর কায় ক্ষীণ
শুরুর নাই চিন্
দীপটি জ্বল্জ্বল্ দিঠির।'

[প্রিয়ার রূপ—নজরুল ইসলাম]

৯। 'হে ঈশ্বর,—
অন্তর্য্যামী দেবতা বিশ্বের,
যথার্থ সত্যের পথ
দাও দেখাইয়া মোরে।—
সত্যই সত্যের কঙ্কাল আমি
করিতেছি পূজা—
কোথা সত্য, কোন কল্পলোকে ?
থেকো না লুকায়ে আর—
শাস্ত্রের জটিল আবর্ত্তমাঝে—
একবার নেমে এস, মৃত্তিকার
ধরণীর' পরে ! তারস্বরে
মর্ম্ম মোর কহে বার বার,—অবিচার
অবিচার ! অবিচার করিয়াছ
জানকীর প্রতি, অবিচার করিয়াছ
প্রফুল্ল কুসুমসম স্ফুটোন্মুখ

সুকুমার যুগল শিশুর প্রতি,
অবিচার করিয়াছ মাতা ভ্রাতা,
আত্মীয়-স্বজন প্রতি, নিজ
হৃদয়ের প্রতি।
অবিচার, কারো প্রতি অবিচার
রাজধর্ম্ম নহে।
ক্ষুদ্র সত্য রক্ষা হেতু বুঝি হায়—
মহা সত্যে দিছি জলাঞ্জলি!
কে বলিবে— ?
শাস্ত্রের বচন সত্য—কিম্বা সত্য
এই মোর মর্ম্মভাঙ্গা
মর্ম্মের কাহিনী।'

[সীতা—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী]

১০। 'পূজাস্থানে দীপ নাই—কাঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল, নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকল রব, গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল। শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে ক্কচিৎ ধ্বনি করিতেছিল!'

[কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১১। 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ?।

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর—
ছায়ামূর্তি তব অনুচর ॥

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্র বেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ—
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ ॥

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে
শুষ্কজল নদীতীরে, শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী—
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী ॥

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর—
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার—
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার ॥

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে—
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ ॥

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে—
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থছায়াতে—
সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে ॥

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধুলা-সম উড়ুক গগনে,
ভরে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ-সনে
আকুল আকাশ—
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ ॥

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে—বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারীহিয়া
চিন্তায় বিকল—
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল ॥

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ !
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ॥'

[বৈশাখ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১২। 'অপূর্ব্ব আলোকছটা উদয় অচলে,
অপূর্ব্ব পুলক জাগে হৃদয়-কমলে !
বুঝিতে না পারি
কি অজ্ঞাত আকর্ষণে
উদ্বেলিত হৃদয় আমার !

কহ বিভাবসু,
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
কেন এই উচ্চ উদ্দীপনা ?
নীচ-কুলোদ্ভব রাধার নন্দন আমি
সূত পুত্র অধিরথ সূত ;
কিন্তু যবে প্রণমি তোমায় দেব'
আনন্দে অধীর—
শুনি যেন অশরীরী বাণী
ধীরে পশে কর্ণে মোর—
দিবাকর আকর আমার,
স্বর্ণ-সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপিত
অভিমানে স্ফুরে এ অন্তর ;
দিন দিন দিনকর সনে
কত আশা—কত সাধ
কত বিচিত্র কল্পনা
রেখায় রেখায় ফোটে অন্তরে আমার।
বুঝিতে না পারি
কিবা মোহিনী-মায়ায়
সমাচ্ছন্ন প্রাণ !'

[কর্ণার্জুন—অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

১৩। 'মৃদঙ্গ মুরুজ বাজে তাতাথৈ তাথৈয়া বাজে ॥
তাথৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গ মধুর বাজে ॥
সবহু' যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আরে ॥
রাসমণ্ডলী মাঝে গোপাঙ্গনাগণ পদচালে
ভঙ্গি করি আরে।
কিবা সেই ভূরু যে করি চালন মাধুরী।
কিবা সেই অঙ্গভঙ্গি গগন ভঙ্গিমা।
কিবা সেই নেত্রগতি বিজুরী উপমা ॥

তাথৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গ মধুর বাজে
সবহু' যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আরে ॥'

[রাসলীলা—রাজা ভাগ্যচন্দ্র

১৪। 'অন্তর্য্যামী জীব মাত্র,
যদি আত্মা হতে স্বতন্তর না করে অন্তর।
শুন ধর্ম্ম,
বিবাহবন্ধন সমাজগঠনহেতু ;
সাম্রাজ্যের সৃষ্টি সমাজরক্ষার তরে।
ধর্ম্মরাজ্য নহে যে সাম্রাজ্য,
লয় তার বাঞ্ছনীয় সদা,
বিশেষতঃ কর্মক্ষেত্র এ ভারতভূমে।
এ পৃথিবী ঈশ্বরের প্রাসাদস্বরূপ,
সপ্তদীপরূপ প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ভক্ত,
প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে কর্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন।
জম্বুদ্বীপ দেবালয় তাঁর ;
সুন্দর এ দ্বীপ উপাসনা মন্দির ধরার।
এ দেশের অধিবাসী পায় পূজা অধিকার
পূর্বকর্মফলে ; ব্যর্থশ্রমে নাহি দেয় মন
উদর পূরণহেতু। হেথা শ্যামলা মেদিনী
উৎপাদনী শক্তি ধরে চমৎকার,
খরধারা স্রোতস্বতী বহে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে
উর্বরতা করিয়া প্রদান, আছে বহু উপাদান
দেবসেবা প্রয়োজন করিতে সাধন।
অয়স শীসক তাম্র রজত কাঞ্চন,
আভরণ তরে মণি বিবিধ রতন,
রক্ষিত যতনে গুপ্ত খনির ভিতর।
ফলফুল শস্য ওষধি ভেষজ,
সহজে সকলি প্রাপ্য সাধকের প্রয়োজন মত।

কীট ক্ষম ক্ষৌমবস্ত্র সূত্ররচনায় ॥
কার্পাস শিমূল, লোম পশুকুল
দেয় নরে হাতে তুলি শীতের বারণ তরে।
দারু শৈল লোহ চূর্ণাদি যোজক বস্তু,
প্রকৃতি আপন করে রেখেছে প্রস্তুত করে,
মন্দির অন্দরে সুন্দর সুন্দর কক্ষ করিত নির্ম্মাণ।
হেথা অশন বসন শয্যা সজ্জা ধন,
দেবোদ্দেশে অগ্রে করে নিবেদন,
তবে লোক প্রসাদ ভুঞ্জিবে।
রঞ্জিতে নিজের মন কোনো ধন না করিবে ব্যবহার;
সব দেবতার, তুমিও তাঁহার :
দাস্যে তাঁর জীবন যাপন করি,
অন্তিমে ব্রহ্মের অংশ ব্রহ্মে হবে লীন।'

[যাজ্ঞসেনী—অমৃতলাল বসু]

১৫। 'তত্র ত্বভিনয়স্যৈব প্রাধাণ্যমিতি কথ্যতে।
আঙ্গিকো বাচিকস্তদাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকোঽপরঃ ॥
চতুর্দ্ধাভিনয়স্তত্র আঙ্গিকোঽঙ্গৈর্নির্দেশিতঃ।
বাচা বিরচিতঃ কাব্যনাটকাদিষু বাচিকঃ ॥
আহার্য্যো হারকেয়ূরবেষাদিভিরলঙ্কৃতিঃ।
সাত্ত্বিকঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈর্ভাবজ্ঞেন বিভাবিতঃ ॥
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্
জাগ্রহ পাঠ্যং ঋগ্বেদাৎ সামেভ্যোগীতমেব চ
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি।
ন তজ্‌জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।'

[নাট্যশাস্ত্র—ভরত]

১৬। হে ভারতভূমি, এক সময়ে তুমি প্রবীণ বীর্যবান্ পুরুষদিগের তপোভূমি ছিলে ; তখন রাজার রাজত্বও তপস্যা ছিল, কবির কবিত্বও তপস্যারই নামান্তর ছিল। তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন করিতেন ; তখন তাপস বাল্মীকি রামায়ণগানে তপঃপ্রভাব উৎসারিত করিয়া দিতেন ; তখন সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যা, সংসারের সকল কর্তব্য, জীবনের সকল আনন্দ, সাধনার সামগ্রী ছিল। তখন গৃহাশ্রমও আশ্রম ছিল, অরণ্যাশ্রমও আশ্রম ছিল। আজ যে কুলত্যাগিনী সংগীতবিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশীর কাংস্যকণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছে, প্রমোদালয়ে সুরাসরোবরে স্খলিতচরণে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, সেই সংগীত একদিন ভরত-মুনির তপোবলে মূর্তিমান হইয়া স্বর্গকে স্বর্গীয় করিয়া তুলিয়াছিল ; সেই সংগীত সাধকশ্রেষ্ঠ নারদের বীণাতন্ত্রী হইতে শুভ্ররশ্মি-রাশির ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতির বিগলিত পাদপদ্ম-নিস্যন্দিত পুণ্য নির্ঝরিণীকে ম্লান মর্তলোকে প্রবাহিত করিরাছিল। হে দুর্ভাগিনী ভারতভূমি, আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদিগের ক্রীড়াভূমি ; আজ তোমার যজ্ঞবেদির পুণ্য মৃত্তিকা লইয়া অবোধগণ পুত্তলিকা নির্মাণ করিতেছে ; আজ সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই ; আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা, বীর্যের স্থলে অহংকার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে। যে বজ্রবক্ষ বিপুল তরণী একদিন উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া মহাসমুদ্র পার হইত আজ সে তরণীর কর্ণধার নাই ; আমরা কয়েকজন বালকে তাহারই কয়েক-খণ্ড জীর্ণ কাষ্ঠ লইয়া ভেলা বাঁধিয়া আমাদের পল্লিপ্রান্তের পঙ্কপল্বলে ক্রীড়া করিতেছি এবং শিশুসুলভ মোহে, অজ্ঞানসুলভ অহংকারে কল্পনা করিতেছি-- এই ভগ্ন ভেলাই সেই অর্ণবতরী, আমরাই সেই আর্য এবং আমাদের গ্রামের এই জীর্ণপত্রকলুষিত জলকুণ্ডই সেই অতলস্পর্শ সাধনসমুদ্র।

ভাব ব্যঞ্জনা

ভাব ব্যঞ্জনা

সব কিছুর আগে, প্রত্যেকটি সংলাপের অন্তরতর সত্যটিকে পূর্ণ মূল্য দিতে চেষ্টা করতাম।

— এন. চের্‌কাশোভ

পেশাদার ও অপেশাদার অভিনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হল, অপেশাদার অভিনেতার একই সুরে সংলাপ বলার প্রবণতা থাকে। এর সহজ কারণ হল, তাঁরা সংলাপগুলো নিয়ে 'চিন্তা' করেন না।

— ভ্যান এইচ. কার্টমেল

অভিনেতা শুধুমাত্র কিছু তথ্য পৌঁছে দেবার জন্য সংলাপ বলেন না। ভাব জাগাবার জন্যই তিনি সংলাপ বলেন,—জ্ঞান বিতরণের জন্য নয়।

— রবার্ট সোর্নাকন ম্যামেন্‌

ভাব যেমন মুভমেন্টকে পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি বাচনভঙ্গিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

— কেনেথ্‌ নাটাল্‌

কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে ভাবের আন্তরিকতা, গভীরতা ও প্রত্যয়ের প্রকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই ভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়।

— আলেকজাণ্ডার ডীন্‌

মানুষ রয়েছে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। বাইরের পরিবেশ থেকে রূপ-রস-শব্দ ও স্পর্শের প্রত্যয় আসছে ইন্দ্রিয়পথে, প্রত্যয়গুলি এসে মনে জাগাচ্ছে ভাবের আন্দোলন। অন্তরে রয়েছে ভাব, স্মৃতিতে বিচিত্র প্রত্যয়, চেতনায় প্রকাশশীলতা—প্রকাশক্ষমতা এবং বাসনা প্রকাশের ইচ্ছা—সমাজের সকলের কাছে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার ব্যাকুলতা।

— ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য

অভিনেতা চেণ্টা করে নানা ধরনের ক্রিয়াকৌশলের সাহায্যে যে ভূমিকায় অভিনয় করছে তার মনের এবং অন্তরের ভাবাবেগকে দর্শকমনে সঞ্চালন করতে।

— অশোক সেন

অনেক অনভিজ্ঞ রসবোধহীন অভিনেতা ঘন ঘন হাততালির প্রত্যাশায় অনেক স্থানে অযথা চীৎকার করিয়া বসেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে—দর্শকমণ্ডলীকে বিরক্ত করা হয় মাত্র। হয়তো বীর রসের অভিনয় করিতে হইবে, কিন্তু বীর যে সর্বদাই চীৎকার করিবে, এমন কোন লেখাপড়া নাই; নাট্যশাস্ত্রে বীর কদাচিৎ উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করেন—সে চীৎকারেও মাধুর্য্য থাকা চাই। আবার অনেকে করুণ রস আয়ত্ত না করিয়া অযথা চীৎকার করেন, তাহা বিশেষরূপ দোষের।

— ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ভাব ও রস যার আয়ত্বের মধ্যে নেই, তার পক্ষে অভিনয়ে কৃতকার্য হওয়া বা চরিত্রের যথাযথ রূপদান করা মোটেই সম্ভব নয়। রসজ্ঞান, ভাবজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে সংসার-চরিত্রের অভিজ্ঞতা এ-বিষয়ে সাফল্য অর্জনের পক্ষে পরম সহায়।

— নির্মল শীল

আইস্‌বার্গ! সমুদ্রে ভাসমান বিরাট তুষারস্তূপ। তিনভাগ জলের তলায় থাকে। মাত্র একভাগ জলের উপর দেখা যায়। জলের উপরে এ যতটুকু নিজেকে ভাসিয়ে রাখে তা দেখে জলের তলায় এ শরীরটিকে কতখানি লুকিয়ে রেখেছে ; এর পরিধি, দৈর্ঘ্য ও ওজন কত তা একমাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেন ছাড়া কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাও বহু অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের চোখেও এরা ধূলো দিতে পারে। ফল হয় মারাত্মক—সংঘর্ষ—জাহাজডুবি।

নাটকের প্রত্যেকটি সংলাপ এক একটি আইসবার্গের মত। নাট্যকার নাটক লিখতে বসলেন। আস্তে আস্তে ভাবগভীরে ডুবে গেলেন। ভাব ব্যক্ত করার জন্য সাহায্য নিলেন ভাষার। শুরু হল শব্দ বাছাই। জোড়া দিয়ে তৈরী হল সংলাপ।

নাট্যকার যে ভাবের প্রকাশ ঘটাতে চাইলেন, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বা ছাপার অক্ষরের সংলাপের মধ্যে তার তিনভাগই লুকিয়ে থাকে, মাত্র একভাগ হয় প্রকাশিত। অন্তর্নিহিত ভাবটি না বুঝে, সংলাপ বলতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য, পরিণাম—ভরাডুবি।

'ভাব' কথাটির অর্থ অনুভূতির আধিক্য। কোন জিনিস দেখলে, শুনলে, পড়লে বা চিন্তা করলে মনের মধ্যে হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি 'ভাব'-এর সৃষ্টি হয়। নাট্যকার সংলাপের মধ্যে এই 'ভাব'-এর যোগান দেন। অভিনেতা সেই ভাবকে প্রকাশ করেন। অভিনয় ভাল হলে দর্শকদের মধ্যে এই ভাব গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়। এই গভীর অনুভূতিরই অন্য নাম 'রস'। 'রস' কথাটির অর্থ আস্বাদন করা। জিভ দিয়ে আস্বাদন করা নয়, অনুভবের দ্বারা আস্বাদন করে তৃপ্ত হওয়া।

ইংরাজী ভাষার 'ফিলিং', 'ইমোশন' ও 'মুড'---এই তিনটি শব্দও মোটামুটি একই অর্থ, একই ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। 'ফিলিং' মানে অগভীর অনুভূতি, 'ইমোশন'---গভীর অনুভূতি। শুধু মাত্রার তফাৎ---যেমন, অল্প আনন্দ আর বেশী আনন্দ। 'মুড' হচ্ছে 'ইমোশন'-এর পরবর্তী পর্যায়, গভীর অনুভূতির পরের কিছু অবস্থা---যেমন, কারও গভীর রাগ, দুঃখ বা ভয় হয়েছে ; তার পরের কিছুক্ষণের অবস্থা। এই অবস্থা থেকে আবার 'ইমোশন' -এর অবস্থায় ফিরে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

স্থায়িভাব	রস
শোকভাব	**করুণ রস**
কোন আনন্দ বিনষ্ট হলে, মনস্তাপ কিংবা কোন প্রিয়জনের বিয়োগ ঘটলে অথবা বন্ধু-বিচ্ছেদ উপস্থিত হলে অন্তরে যে আকুলতা ও কাতরতার সৃষ্টি হয়, শোকভাব তারই প্রকাশ। শোক হচ্ছে করুণ রসের স্থায়িভাব।	শোক এই রসের স্থায়িভাব। উদাহরণ ঃ 'রামায়ণ' করুণ রসপ্রধান।
হাস্যভাব	**হাস্যরস**
হাস হচ্ছে হাস্য রসের স্থায়িভাব।	হাস বা হাসি এই রসের স্থায়িভাব। উদাহরণ ঃ সুকুমার রায়ের 'চলচিত্ত চঞ্চরী'।
ক্রোধভাব	**রৌদ্ররস**
প্রতিহিংসাবোধ কিংবা অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা যখন মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে ও তার ফলে সৎবৃত্তি বিনষ্টকারী যে সব কাজের অবতারণা প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে, তাই ক্রোধ বা কোপের লক্ষণ। ক্রোধ রৌদ্ররসের স্থায়িভাব।	ক্রোধ উৎপাদনকারী রসকে রৌদ্ররস বলে। অর্থাৎ যে রস মন-প্রাণ উত্তেজিত করে মনের মধ্যে ক্রোধের ভাব জাগিয়ে তোলে, তাই রৌদ্ররস। উদাহরণ ঃ 'রাবণ','পরশুরাম' ও 'দুর্যোধন'-এর চরিত্র।
উৎসাহভাব	**বীররস**
কোন একটি কাজ আরম্ভের আগে যে উদ্দীপনা বা অমিত আগ্রহের সঞ্চার হয়, তাই উৎসাহ। উৎসাহ বীররসের স্থায়িভাব।	যে রস উৎসাহ বৃদ্ধি করে ও কোন বীরোচিত কাজ করার প্রেরণা যোগায় তাই বীররস।

স্থায়িভাব	রস
অনুরাগ বা রতিভাব	**শৃঙ্গার বা আদিরস**
যে ভাবের ফলে মন-প্রাণ প্রেমরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যে আসক্তিজনক ভাবের দ্বারা শৃঙ্গার প্রভৃতি কাজের জন্য মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, তাই রতিভাব। শৃঙ্গার এই ভাবের স্থায়ী রস।	রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে তৃপ্তি বা উপভোগ সঞ্জাত হয়, তাই শৃঙ্গার রসের ভাব। উদাহরণ ঃ 'শকুন্তলা কাব্য' আদি রসপ্রধান।
ভয়ভাব	**ভয়ানক রস**
আতঙ্ক, সন্ত্রাস যে কারণে জাগ্রত হয় তাই হচ্ছে ভয়ভাব। শত্রু বা কোন অস্ত্রধারীর আক্রমণের সূচনায় নিজের জীবনহানি কিংবা আত্মজনহানি অথবা সম্পদহানির ভয়ে যে দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ভয়।	ভয় হচ্ছে এই রসের স্থায়িভাব।
জুগুপ্সাভাব	**বীভৎস রস**
জুগুপ্সা অর্থে নিন্দা, কুৎসা, ঘৃণা ইত্যাদি বোঝায়। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কোন আচার বিরুদ্ধ বা অসংলগ্ন দোষ দেখার ফলে মনের মধ্যে যে ঘৃণা-জনক ভাবের সঞ্চার হয়, তাকেই জুগুপ্সাভাব বলে।	জুগুপ্সা এই রসের স্থায়িভাব। উদাহরণ ঃ 'বেণীসংহার'।

স্থায়িভাব	রস
বিস্ময়ভাব	**অদ্ভুত রস**
অলৌকিক বা লোকাতীত অর্থাৎ যে সব ঘটনা সচরাচর চোখে পড়ে না, এরকম কোন ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করলে কিংবা সে সম্বন্ধে কিছু শুনলে মনের মধ্যে যে আশ্চর্যজনক ভাবের উন্মেষ ঘটে, তাই বিস্ময়।	বিস্ময় এই রসের স্থায়িভাব।
শমভাব	**শান্তিরস বা বাৎসল্য রস**
সংসার ও ঐশ্বর্য প্রভৃতির অসারতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে পরাজ্ঞান লাভের ফলে মনের মধ্যে যে শান্ত, পবিত্র ভাবের উন্মেষ সম্ভব হয়, তাকেই শমভাব বলে।	শম এই রসের স্থায়িভাব। উদাহবণ ঃ 'মহাভারত' শান্তিরস প্রধান।

উপরিউল্লিখিত ন'টি স্থায়িভাব ছাড়াও আছে সঞ্চারীভাব। সমুদ্রের জলে যেমন একবার ঢেউ ওঠে আবার হারিয়ে যায়, তেমনি এই সঞ্চারীভাবও স্থায়িভাবের উপর কখনো কখনো আবির্ভূত হয়, আবার মিলিয়ে যায়।

সঞ্চারীভাব	ব্যাখ্যা
নির্বেদ	ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্যসূচক ভাব
আবেগ	মনের ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য প্রভৃতি আবেগের লক্ষণ
দৈন্য	দারিদ্র বা দৈন্যদশার কারণে সঞ্জাত যে কাতরতা বা সন্তাপ

সঞ্চারীভাব	ব্যাখ্যা
শ্রম	পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিভাব
মদ	আনন্দ বা আনন্দজনিত সম্মোহভাব
জড়তা	জড়বুদ্ধি বা অস্বচ্ছন্দ চিন্তার প্রকাশ
উগ্র	ক্রুদ্ধ ভাব
মোহ	মূর্ছা, অচৈতন্য অথবা অজ্ঞতা প্রকাশক ভাব
বিরোধ	বৈপরীত্য, অনৈক্য ইত্যাদি বিরোধীভাব
স্বপ্ন	নিদ্রালু বা নিদ্রাজনিত ভাব
অপস্মার	গ্রহাদির আবেগ বা কোপজনিত কারণে মানসিক আক্ষেপ ও মনস্তাপ
গর্ব	দর্প, অহঙ্কার, ইত্যাদির কারণে হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হয় তাই গর্বভাব
মরণ	মৃত্যু, দেহনাশ অথবা প্রাণবায়ু বেরিয়ে আসার উপক্রমজনিত ভাব
আলস্য	প্রবৃত্তিহীনতা, অমনোযোগ এবং সামর্থহীনতা বা মন্দ সামর্থের কারণে সঞ্জাত ভাব
অমর্ষ	ক্ষমাহীনতা এবং অসহিষ্ণুতার ভাবোদ্দীপক যে ভাব তাই অমর্ষ
নিদ্রা	শারীরিক বা মানসিক কারণে বিরাম বা নিদ্রালু ভাবের যে আবেগ

সঞ্চারীভাব	ব্যাখ্যা
অবহিথা	অন্তরের ভাব গোপন রেখে বাইরে অন্যরকম ভাব প্রকাশ করা
ঔৎসুক্য	ব্যগ্রতা, উৎকণ্ঠা
উন্মাদ	হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা, ভালমন্দের বিচারশক্তি-হীনতা, সাধ্য-অসাধ্য বিবেচনা করে না চলা
আশঙ্কা	আপন অনিষ্ট চিন্তা থেকে ভয়, সন্দেহ, সঙ্কোচ প্রভৃতি ভাবের উদয়কে আশঙ্কা ভাব বলে
স্মৃতি	পূর্বে অনুভূত বা অনুষ্ঠিত কোন বিষয়ের যে চিন্তা বা জ্ঞান
মতি	ধর্ম ও নীতির পক্ষপাতী হয়ে শাস্ত্রসম্মত কাজ করার যে বিচারবুদ্ধি জ্ঞান বা অন্তঃকরণের প্রয়োজন।
ব্যাধি	প্রিয়জনের মরণকালে অস্থিরতা, দুর্বলতা কিংবা বিকৃত রুচির কথাবার্তা প্রয়োগ
সন্ত্রাস	হঠাৎ বারংবার বিদ্যুৎ-চমক, উল্কাপতন, বজ্রনাদ, শত্রু কিংবা অন্য হিংস্র শ্বাপদের গর্জনে সহসা মনের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়।
লজ্জা	কোনরূপ সুন্দর বা অসুন্দর, উচিত বা অনুচিত কাজ করার ফলে কেউ প্রশংসা বা তাচ্ছিল্য করলে যে সঙ্কোচ ভাব প্রকাশিত হয়

সঞ্চারীভাব	ব্যাখ্যা
হর্ষ	কোনরূপ আনন্দকর বা মঙ্গলসূচক ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে দেখলে কিংবা সেরকম কোন কিছু সংবাদ শুনলে অথবা কোন অভিলাষ পূর্ণ হলে মনে যে প্রসন্নতা বা আনন্দের ভাব সঞ্চারিত হয়।
অসূয়া	পরশ্রীকাতরতা
বিষাদ	আরব্ধ কাজের কারণে অনুতাপ করা, কিংবা নিজের দোষ বুঝতে পেরে ক্ষুন্ন হওয়া ইত্যাদি ভাব
ধৃতি	ধৈর্য
চপলতা	মনের লঘু চপল ভাব
গ্লানি	মনস্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ প্রভৃতির কারণে যে চিত্তদৌর্বল্য উপস্থিত হয়
চিন্তা	মনন, ধ্যান, ভাবনা কিংবা উপাসনা এ সমস্তই চিন্তা
বিতর্ক	দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা, বিচার, বিতণ্ডা, বাদানুবাদ, সংশয়, অনুমান, তর্ক।

এরপর আছে সাত্ত্বিক ভাব। এর বিশেষত্ব স্বভাবগত বা মেজাজগত। চরিত্রের নিজস্ব স্বভাবের জন্য অথবা নাট্যক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ও প্রদত্ত পরিবেশ অনুসারে এই ভাব গুরুত্ব অর্জন করে।

সাত্ত্বিক ভাব	**লক্ষণ**
স্বেদ	ঘাম
স্তম্ভ	স্থির
বেপথু	কাঁপা
অশ্রু	চোখের জল
বৈবর্ণ	বর্ণহীনতা
রোমাঞ্চ	শিহরণ
স্বরভেদ	কণ্ঠ পরিবর্তন
প্রলয়	জ্ঞানহীনতা

পূর্বোক্ত ন'টি স্থায়িভাব ও সমস্ত উপভাবকে আপন কণ্ঠের আয়ত্বে রাখুন ; যখন যে ভাবটি প্রয়োজন হবে, তা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া চাই।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা নিজস্ব ভাব ও চিন্তাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু নাটকের সংলাপ বলার সময় সেটিই কেমন কৃত্রিম হয়ে পড়ে। এর কারণটি হল, ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যা চিন্তা করি, অনুভব করি, তাই বলি। নাটকের ক্ষেত্রে, নাট্যকার যে সংলাপ লিখেছেন, অর্থ না বুঝে তাই বলার চেষ্টা করি—যে চিন্তা, উপলব্ধি বা ভাব থেকে নাট্যকার সংলাপ লিখেছেন তা ভাবি না, অনুভব করি না, তাই এই ব্যর্থতা।

ভাব প্রকাশ করতে গেলে সর্বপ্রথম নিজের বুদ্ধিগত শক্তি দিয়ে বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে, তারপর কণ্ঠস্বরে সেই ভাবকে প্রকাশের চেষ্টা করতে হবে।

অনুশীলনী

প্রথম ধাপ

১। 'না', 'হ্যাঁ', 'সত্যি'—এই তিনটি শব্দের সাহায্যে নীচের ভাবগুলো প্রকাশ করুন।

বিস্ময়, নিদারুণ অবজ্ঞা বা ঘৃণা, যন্ত্রণা, উত্তেজনা, তীব্র ব্যঙ্গ, একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি, সন্দেহ, ঔৎসুক্য বা আকুলতা, ভালোবাসা, অবিশ্বাস, দৃঢ়সংকল্প, ক্লান্তি, আতঙ্কজনিত কম্পন, হতাশা, আনন্দ।

২। —"চলে যাও"—এই বাক্যটির সাহায্যে ২০ রকম ভাব প্রকাশ করুন। যেমন—

ভালোবাসা, আনন্দ, লজ্জা, ব্যগ্রতা, সন্দেহ, ঘৃণা, সংশয়, উত্তেজনা, ক্রোধ, নিদারুণ বিরক্তি, সমবেদনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধাপ

একটি চেয়ারে বসুন। রিল্যাক্স্ করুন। মাথাটি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিন। চোখদুটো বন্ধ করুন। কোলের উপর হাতদুটোকে আলতোভাবে রাখুন। নীচের সংলাপটি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকুন। সংলাপের মধ্যে যে ভাবটি আছে তা অনুভব করতে থাকুন। এবার সংলাপটি বলুন।

'তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে, যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর এই সাম্রাজ্য ভোগ কর ; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয় ; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।'

[সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

পরের পাতার সংলাপগুলো একে একে বলবার চেষ্টা করুন। প্রত্যেকটি সংলাপ বলার পর রিল্যাক্স্ করবেন। শরীর ও গলায় কোন রকম উত্তেজনা যেন না থাকে। প্রত্যেকটি সংলাপই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ। তাই প্রত্যেকটি

সংলাপ বলার আগে নির্দিষ্ট ভাবটি অনুভব করুন ও পরে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটি প্রকাশ করার চেষ্টা করুন।

আদিরস

'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার—
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার ॥'

[অনন্ত প্রেম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বীররস

'সাজ, হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।'

[মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন]

করুণরস

'সুখের—এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া
আজ কোথা তুমি চলে গেলে, হায় সংসার আঁধারিয়া ?
দু'বেলা পাওনি পেট ভরে খেতে, গিয়েছিল দেহ ভেঙ্গে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেঙ্গে।'

[কালিদাস রায়]

হাস্যরস

'আজি হ'তে যজ্ঞ দিন
দুটি বেলা করিব গণনা,—
কি কি করিব আহার
ফর্দ তার করিব রচনা,
আর যজ্ঞ-কার্যে সাহায্য করিতে
খাবারের ঘরে রহিব ভাণ্ডারী।

নিজ হাতে লিখে দিব দ্বারে—
'প্রবেশ নিষেধ সবাকার'।
আর আমি সেথা বসিয়া বসিয়া
মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারি
মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করিব সুখে।

বাৎসল্য রস

'সত্য করে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে—তোরে আমি নারিব হারাতে।'

[বিসর্জন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

অদ্ভুত রস

'কি আশ্চর্য, নৈকষেয়! কভু নাহি দেখি
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে।'

[মাইকেল মধুসূদন]

ভয়ানক রস

'কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার সাগরে
মগ্ন ধরা।
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক! নিশার আকাশে,
অদৃশ্য প্রহরী কেন যেন ঘোর রবে
ফুকারিছে—সাঁ সাঁ করে; বিশ্ব চমকিত।
কে আমি! পড়িয়ে এই জলধির তলে।
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি: কে আমি রজনী?'

শান্তরস

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

অন্তর গ্লানি সংসার ভার,
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার
রাখিবারে যদি পাই—'
[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বীভৎস রস

ঐ বদ্ধ জলার উপরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিঃশ্বাস আটকে আসছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ কর্চ্ছে। —প্রভাতের সর্বাঙ্গে ঘা! পূঁয পড়ছে।

[চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

তৃতীয় ধাপ

কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট ন'টি স্থায়িভাবকে প্রকাশ করার অভ্যাস করলেন। এবার একই সংলাপের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সঞ্চারীভাবকে দ্রুত স্বর-পরিবর্তনের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ঐ জায়গাটি একবার পড়ুন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, যেখানে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

'সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাভবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে !
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?'
[মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন]

এই কয়েকটি ছত্রে বীরত্ব ও বিনয় একাধারে মেশান আছে। সংলাপ বলার সময় সতর্ক হয়ে উপরের দুটো ভাবকেই আলাদাভাবে ভাগ করে নিতে হবে ও

স্বরবিন্যাসের সাহায্যে প্রকাশ ঘটাতে হবে। এরকমভাবে একই সময়ে এক আবেগ থেকে আরেক আবেগে কণ্ঠস্বরকে নিয়ে যেতে হবে অবলীলাক্রমে অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত আবেগের পর পর অতিদ্রুত প্রকাশ ঘটাতে হবে। যেমন ঃ

১। 'তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছ! তুমি আমায় সম্রাট্ করেছ। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে আবার স্বর্গে উঠিয়েছ। আমি তোমায় বধ ক'রে তোমার মূর্ত্তি গাড়িয়ে পূজা কর্ব্ব। না, না—এ কি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে—এ যে—না, একটা কিছু কর্ত্তে হবে; যাতে বুঝতে পারি যে আমি বেঁচে আছি।'

২। 'ক্যাত্যায়ন! নাড়ী দেখতে জানো? দেখ ত আমি বেঁচে আছি কিনা? দেখ ত এ ইহকাল, না পরকাল? এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয়-কল্লোল?'

[চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

৩। 'যা করেছি—ধর্ম্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হ'ত—উঃ কি অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!'

[সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

৪। —ক্রি-ররররিং—

—হ্যালো—

—'—'

—স্পিকিং

—'—'

—আরে তুই, কবে কলকাতায় এলি!

—'—'

—কোথায় উঠেছিস।

—আমাদের বাড়িতে কখন আসছিস ?

—'—'

—কেন ?

—'—'

—তাই নাকি ? কবে মারা গেলেন ?

—'—'

—কি হয়েছিলো ?

—'—'

—'—'

—ও, তাপসও তোর সাথে এসেছে ।

—'—'

—কবে বিয়ে ?

—'—'

—লাভ ম্যারেজ !

—'—'

—তাই নাকি !

—'—'

—না—ওর সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা হয়নি ।

—'—'

—আমার সঙ্গে দেখা হলে ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে ।

—'—'

—আমি ওকে কিছুতেই ছাড়ব না । ওর কয়েকটা দাঁত ফেলে তবে আমার শান্তি ।

—'—'

—সেকি ! ও আজকাল ছোরা নিয়ে ঘুরছে নাকি !

—'—'

—না—আমি ত তেমন কিছু বলিনি ।

—'—'

—তাই বুঝি—আমি ত এমন জানতাম না ।

—আহা—বেচারী ! তারপর—
কট্—কট্—কট্—কট্—কট্
—'হ্যালো—হ্যালো'—
—'—'
—ক্রস্ কানেকশন্, লাইনটা ছেড়ে দিন ।
—'—'
—আপনি আগে ছাড়ুন । আমার আর্জেন্ট কথা আছে ।
—'—'

—আচ্ছা—হ্যালো—হ্যাঁ বল্—যাঃ সত্যি ! তবে যে গোপা বলল—হ্যালো—হ্যালো—কি হচ্ছে কি ! কেন ট্যাপ্ করছেন । না, ছাড়ব না—ধ্যাৎ—হ্যালো—আরে দেখ্না মাঝখান থেকে কোন্ হরিদাস পাল ট্যাপ্ করছে— হ্যালো—হ্যালো—বেশ করেছি—বলেছি না—ছাড়ব না—আমি অনন্তকাল ফোন ধরে থাকব ।
—হ্যালো—হ্যালো···

উপরের প্রত্যেকটি সংলাপের মধ্যেই বিভিন্ন ভাবের খুব সূক্ষ্ম ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে । কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এত কম সময়ে এই পরস্পর-বিরোধী ভাবের প্রকাশ ঘটান খুবই শক্ত কাজ । তবে দীর্ঘদিন অভ্যাস করলে ও কণ্ঠস্বরে প্রত্যেকটি ভাবের প্রকাশ যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে তবেই এই দুরূহ কাজ সম্ভব । কণ্ঠস্বরের সাহায্যে এসমস্ত ভাবের যে প্রকাশ ঘটাবেন তা সত্যি সত্যি ও সঠিকভাবে প্রকাশিত হল কিনা তা কি করে বুঝবেন ?

টেপ রেকর্ডারে টেপ করে বাজিয়ে শুনতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয় । বিজ্ঞানের এই আশীর্বাদটিকে এই ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে কাজে লাগান, চমৎকার ফল পাবেন । এ ব্যাপারে ও-ই আপনার শ্রেষ্ঠ বিচারক ; নিজেই দোষ-ত্রুটি ধরতে পারবেন, আবার রি-টেপ করে শোধরাতেও পারবেন । আর যদি টেপ রেকর্ডার নেহাতই জোগাড় করতে না পারেন তাহলে সতীর্থ অভিনেতাকে আপনার বিচারক করুন । পরীক্ষা দেবার সময় বিচারক যিনি হবেন তিনি যেন আপনাকে দেখতে না পান, সেরকম ব্যবস্থা করবেন । শুধু আপনার কণ্ঠস্বরই তিনি শুনতে পাবেন । পরস্পর উল্টোদিকে মুখ করে বসে,

অথবা বিচারক চোখ বন্ধ করে বা আপনার সামনে কোনকিছু আড়াল রেখে সংলাপ বলতে পারেন।

অনুশীলনের জন্য আরও কয়েকটি সংলাপ দেয়া হ'ল। কোন্‌টি কোন্‌ ভাব ও রসের প্রকাশ তা আপনার চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে নির্ণয় করুন ঃ

১) 'কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ !
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে ! সে কাহার খেলা ?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কি জীব নহে ? ..
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে—
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—'

['বিসর্জন'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২) 'নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শল্মলী তরুবরে ?'

[মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন]

৩। 'হে অদৃশ্য মহাশক্তি ! খাসা নিয়ে চলেছ ! ভেসে যাচ্ছি ! কি মধুর তোমার ঐ কুটিল দৃষ্টি, বক্র হাসি, তির্য্যক্ গতি, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, পঙ্কিল স্পর্শ। এই ছেড়ে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম। কি কুৎসিত তুমি, প্রেয়সী ! আমি যত দেখ্‌ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি—একটা কৃষ্ণ দাবানল

উঠে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে লেহন কর্চ্ছে। বনের ব্যাঘ্র তা'র ম্রিয়মান নিস্পন্দপ্রায় শিকারকে লোলুপ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখ্‌ছে। —ওঃ কি ভীষণ! কি সুন্দর!'

[চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

৪) 'একি—একি ?
এঁকি হেরি—বিভীষিকা!
শত কত কালান্তক সর্প
ধ্বংসময় কালকূট করি উদ্গিরণ,
ভীষণ গর্জ্জন সহ—
লক্ষ করি বক্ষ মোর—
ওই আসে—ওই আসে—
দংশিল—দংশিল মোরে।

[কর্ণ—ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ]

৫) 'দে রে নন্দীকেশ! দে দেখি ত্রিশূল,
অমরবৃন্দ আজ করিব নির্মূল!
দেব—কুলাঙ্গার, এত দর্প তোর ?
দেখিব কে রাখে তোরে মহেশের রোষে!
খসিবে তপন তারকানিকর,
রেনুময় হবে হিমাদ্রিশিখর,
গরলপূরিত হবে প্রভাকর।

৬) হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!'

[মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন]

৭) —রে রাখাল !
কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল ?
ত্যজি সংসার—আশ্রয়,
পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর,
সে রাখে রহিব,
সে মারে মরিব
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন।'

[বিল্বমঙ্গল—গিরিশচন্দ্র]

৮) 'ব্রুটাস, তুমিও ! তাহলে সীজার, তোমার মৃত্যু হোক।'

[জুলীয়াস সীজার—সেক্সপীয়র]

৯) জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব—'পরে।

[কর্ণকুন্তীসংবাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১০) 'আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয় ! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চূরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তা'কে এসে গ্রাস কর্। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয় ! আয় ত ; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চলে' যাই—

[সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ছন্দ

ছন্দ

যেখানেই জীবন, সেখানেই ক্রিয়া ; যেখানেই লয়, সেখানেই ছন্দ ।

— কন্‌স্তান্‌তিন্‌ স্তানিস্লাভস্কি

জীবন প্রবাহিত হয়, ছন্দ তাকে বহু কারুকার্যখচিত নকশায় বিন্যস্ত করে ।

— ওরভিল লারসন্‌

ছন্দ হ'ল সেই প্রবাহ ও চলন অথবা প্রবাহ ও চলনের বাহ্য রূপ যা স্বাভাবিক জীবন এবং জীবনশক্তি প্রকাশের পথে কার্যকর ও প্রয়োজনীয় ।

— ডেরেক বাউস্কিল

সেই মৌল পদার্থটিই ছন্দ যা ধ্বনিগুলোকে একত্রিত করে ; কিন্তু এই কাজটি করা সত্ত্বেও সমগ্রটি বৈচিত্র্যময়, চিত্তাকর্ষক ও সমগুণভাবাপন্ন করার জন্য ধ্বনিগুলোর উৎকর্ষতাকেও সে মেনে নেয় ।

— গ্যেয়নেথ থারবার্ন

আমরা প্রায়ই দু'রকম ছন্দের কথা বলি—অন্তরঙ্গ ছন্দ এবং বহিরঙ্গ ছন্দ । অন্তরঙ্গ ছন্দের মন্থরতা বা দ্রুততা স্থির বা বেগবান ক্রিয়ার দিকে পূর্বগামী নাও হতে পারে অথবা বাচনভঙ্গিতে অনুরূপ পরিবর্তন নাও আসতে

পারে। ধীরগতি এবং সুরসমৃদ্ধ সংলাপ যেমন অন্তরঙ্গ ছন্দের উত্তাপটিকে প্রকাশ করতে পারে, তেমনি প্রাণবন্ত চলন এবং তীব্র বাচনভঙ্গির মধ্যেও অন্তরঙ্গ শান্তভাবটি উন্মোচিত হতে পারে।

— এন চেরকাশোভ

ছন্দ তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে ঃ ক) স্বরভঙ্গির ব্যবধান রক্ষা— স্বরভঙ্গি বলতে এখানে কোন শব্দেব মধ্যে একটি বিশেষ অক্ষরের উপর ঝোঁক বা জোর দিয়ে বলা বোঝাচ্ছি। খ) সময়জ্ঞান ঠিক রেখে হ্রস্ব বা দীর্ঘ শব্দপ্রক্ষেপণ গ) সঙ্গীতের বিশ্রামের মত বিরতি।

— ডরোথী বার্চ

ছন্দ বলতে ঠিক কি বোঝায় ? একঘেয়ে এবং একটানা শব্দতরঙ্গের বদলে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মাত্রার দ্বারা নিয়মাবদ্ধ শব্দের গতিকেই বলা হয় ছন্দ।

— অশোক সেন

অভিনয়ের সময় বাক্যগুলি যদি একই রকমভাবে উচ্চারিত হয় তবে অভিনয় একঘেয়ে হয়ে পড়ে। সেজন্য অভিনয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্য বাক্যগুলিকে যেমন কণ্ঠের উঁচু ও নীচু পর্দায় উচ্চারণ করতে হয়, তেমনি আবার কখনো দ্রুত ও কখনো বিলম্বিত লয়ে বলে যেতে হয়।

— ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

মনস্তাত্ত্বিক বিরতি

'যুক্তিসম্মত বিরতি' মস্তিষ্কের সেবা করে, 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এটিকে বলা যায় অলঙ্কারপূর্ণ নীরবতা। এই বিরতির সময় কাজ করবে চোখ-মুখের অভিব্যক্তি ও ইঙ্গিতপূর্ণ চলাফেরা।

উদাহরণ ঃ

'এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে দুইজন যুদ্ধবন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল ও বাকী সবাইকে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। যে দুইজন যুদ্ধবন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল তাহাদের নাম, সুরজিৎ সেনগুপ্ত (এখানে নাট্যকৌতূহল বাড়িয়ে দেবার জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক বিরতি দেয়া হল) এবং (আবার মনস্তাত্ত্বিক বিরতি) যশোবন্ত কাউল। এই বিরতির সংগে সময়ের কোন সম্পর্ক নেই। নাট্যমুহূর্ত তৈরী করার জন্য এটি যতক্ষণ প্রয়োজন তত সময় ধরে রাখতে পারেন, এমনকি একটি পুরো দৃশ্যও 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি' দিয়ে সাজাতে পারেন।

সর্ত

১। মন্থরতা ও একঘেয়েমির বিপদ থেকে 'মনস্তাত্ত্বিক বিরতি-কে সতর্কভাবে পাহারা দিতে হবে। একঘেয়েমি আসার আগেই সংলাপকে জায়গা করে দেবেন।

২। শুধুমাত্র বিরতি-র স্বার্থেই বিরতি-র ব্যবহার যেমন উচিত নয়, তেমনি একটি অতিসাধারণ বিরতি-র মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিরতি-র মৃত্যু শৈল্পিক কারিগরিতে শূন্যতা সৃষ্টি করবে।

৩। অর্থহীনভাবে যদি মনস্তাত্ত্বিক বিরতির ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু দর্শকরা বিরক্ত বোধ করবেন অথবা ভাববেন আপনি পার্ট ভুলে গেছেন।

বাতাস নেবার জন্য বিরতি

এটি বিরতিগুলোর সংক্ষিপ্ততম একটি। দ্রুত বাতাস নেবার পক্ষে এটি যথেষ্ট কার্যকর। আঙ্গুলের একটি তুড়ি মারতে যতখানি সময় লাগে তার

চেয়ে বেশী সময় এ নেয় না। এমনকি প্রায়ই এটি একটি সত্যিকারের বিরতি-ও হয়না, এটি সংলাপকে বাধায় অবস্থাতেই রাখে। আমরা যাকে চোরাদম বলি, এই বিরতি তাই। দ্রুত সংলাপ বলার সময় এই বিরতি খুব কাজে লাগে।

শব্দের উপর জোর দেবার জন্য বিরতি

কোন শব্দের উচ্চারণের আগে যদি সচেতন ও সুনিশ্চিত বিরতির ব্যবহার করা যায় তবে সেই শব্দের প্রতি দর্শকদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করা যায়, শব্দটি তীক্ষ্নতর ভাবে প্রক্ষেপিত হয়, শব্দটির অর্থের গুরুত্বটিতে একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজন করে।

উদাহরণ :

'তোমরা কি ভাবছ যে আমি কে বা কি কবি ? তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে আমার কথা শোনেনি এবং আমি এখানে কেন এসেছি তা' জানোনা ? (অল্প বিরতি) **কেউ নেই ?** যদি কেউ থাকো তাহলে বল। (দীর্ঘ বিরতি) **কি, কেউ নেই ?**'

সংলাপটি পড়ে যান। 'কেউ নেই' কথাটি বলার আগে অল্প বিরতি দিন। আবার দ্বিতীয় 'কেউ নেই' কথাটি বলার আগে আরো বেশীক্ষণ বিরতি দিন। অল্প বিরতির পর প্রথম 'কেউ নেই' কথাটির গুরুত্ব বেড়ে যাবে ও পরের দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় 'কেউ নেই' কথাটি আরো তীক্ষ্ণতরভাবে প্রকাশিত হবে।

ভাবের পরিবর্তনে বিরতি

একটি ভাব থেকে অন্য ভাবে যাবার আগে বিরতি ব্যবহার করলে প্রত্যেকটি ভাবকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।

উদাহরণ :

১। কর্ণ ॥ মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয় (বিরতি)।

সংলাপ প্রয়োগ ও ছন্দ

আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক সংলাপ বলতে গেলেও ছন্দ এসে পড়বেই। 'বিরতি'-র সুচিন্তিত ব্যবহার, 'গতি'-র নিয়ন্ত্রণ, 'এম্‌ফ্যাসিস-এর মাত্রাবোধ ও 'সুর'-এর সুষ্ঠু প্রয়োগেই ঐ ছন্দ আনা সম্ভব। বুকের স্পন্দনের কথা ভাবুন। সমস্ত শরীরের সজীবতার পেছনে অলক্ষ্যে থেকে যেমন এই আভ্যন্তরীণ শক্তি কাজ করে চলেছে, তেমনি চমৎকার ও আকর্ষণীয় সংলাপের পেছনেও গতি, এম্‌ফ্যাসিস্, বিরতি ও সুর—এই শক্তিগুলোর কাজ করা চাই। এই চারটির সংমিশ্রণেই আসবে ছন্দ—যেমন সাতরঙের মিশ্রণের যোগফল মনোরম রামধনু।

বিরতি

বিরতি

সঠিক সময়ে নীরবতা সংলাপের চেয়েও বেশী বাঙ্ময়।

— মার্টিন ফারকুয়ার টুপেপ

সংলাপের অর্থ পরিষ্কার করে বোঝার পক্ষে বিরতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

— কার্ল এ্যালেনস্‌ওয়ার্থ

বিরতি দু'টো প্রধান কাজ করে : সংলাপের শ্রুতিগ্রাহ্যতা ও বোধগম্যতাকে নিশ্চিত করে এবং ভাব-ব্যঞ্জনাকে উদ্দীপিত করে।

— জে. ক্লিফোর্ড টারনার

বিরতি বাগ্মিতার একটি পুরোনো কৌশল। কিন্তু প্রাচীনতা এটির সুনাম এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেনি—উপরন্তু মূল্যমান বাড়িয়েছে।

— এফ. ই. ডোরান

সুচিন্তিত অর্থবহ বিরতি যে কোন সংলাপের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী।

— টাইরোন গুথ্‌রিক

স্পষ্ট করে ছোট ছোট বিরতি দিয়ে কথা বললে মূল কথাগুলোর উৎকর্ষতা বাড়ে, অন্যান্য বাক্য থেকে তাদের আলাদা করে বোঝা যায়। শব্দহীন দীর্ঘ বিরতি সংলাপকে নতুনভাবে ভাবময় করে তোলে।

— কন্‌স্তান্‌তিন্‌ স্তানিস্লাভস্কি

ভাবপ্রবাহের কোন্ জায়গায় উপযুক্ত বিরতি দিতে হবে তা পূর্বাহ্নেই পরিকল্পনা করা উচিত। নতুবা সাবলীলতা নষ্ট হবে, সংলাপগুলো অর্থহীন হৈ-চৈ আওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে।

— পিটার ক্যাপন্

একমাত্র অভিজ্ঞতাই বিরতিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে শেখায়, কারণ এই বিরতি 'সময়জ্ঞান'-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা দক্ষ অভিনেতার একটি মূল্যবান সম্পদ।

— ভ্যান এইচ কার্টমেল

নাটকীয় বিরতি, তা হ্রস্ব বা দীর্ঘ যা-ই হোক, গুরুত্বপূর্ণ ভাবগুলোতে এম্ফ্যাসিস্ দেয় এবং দর্শকদের কৌতূহল বজায় রাখার জন্য সুপরিকল্পিত-ভাবে প্রয়োগ করা যায়।

— এন. চেরকাশোভ

যে অভিনয়শিল্পীর যতিজ্ঞান যত বেশী সে তত বড় অভিনয়শিল্পী। সঙ্গীতে যেমন তাল-লয় জ্ঞান সবার ওপরে, অভিনয়েও যতিজ্ঞান তেমনি ধারা। তালের অভাবে যেমন গান জমে না, যতির অভাবেও তেমনি অভিনয় জমে না।

— নির্মল শীল

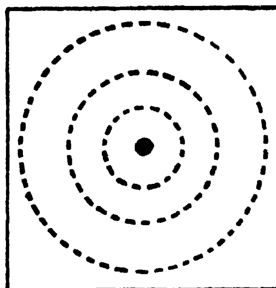
ক্ষণস্থায়ী বা সুদীর্ঘ এই উভয় জাতীয় বিরতিই নাটকের প্রধান প্রধান চিন্তার বিষয়বস্তুকে দর্শকের মনে গেঁথে দেয় এবং নাটককে করে তোলে রহস্যঘন ও কৌতূহলোদ্দীপক।

— অশোক সেন

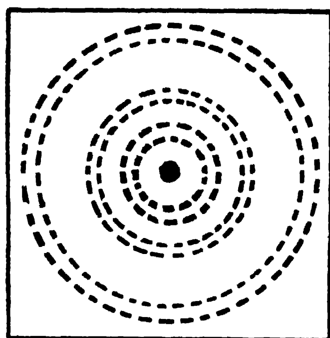
কখনো বলতে বলতে সুকৌশলী অভিনেতা হঠাৎ থেমে যান এবং দর্শকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা খুব ঘনীভূত করে তারপর পরবর্তী কথা যেন নিক্ষেপ করে দেন। সাময়িক বিরতির পর একটি কথা বললে সেই কথার গুরুত্ব খুব বেড়ে যায় এবং তখন দর্শকের কৌতুক অথবা কারুণ্য প্রবল বেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে।

— ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

জলভর্তি পাত্রে একটি মটরের ডাল ফেললে নীচের ছবিটির মতই কয়েকটি বৃত্ত সৃষ্টি হবে।



কিন্তু পরপর কয়েকটি মটরের ডাল ফেললে নীচের ছবিটির মত অনেকগুলো বৃত্তের সৃষ্টি তো হবেই, একটি আরেকটির উপর দিয়ে চলে যাবে, কোনটিই স্পষ্ট বোঝা যাবে না।



যদি খুব দ্রুত সংলাপ বলেন, মাঝে মাঝে 'বিরতি' না দেন, তবে সমস্ত সংলাপগুলোই একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িয়ে যাবে, কোনটির অর্থই দর্শক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না।

নাট্যকার নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী 'বিরতি'-র কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যেমন—কমা, সেমিকোলন, কোলন, কোলন-ড্যাস, দাঁড়ি, হাইফেন, ফুটকি—অর্থাৎ

সংলাপ বলার সময় কোথায় কম থামতে হবে, কোথায় বেশীক্ষণ বিরতি দিলে ভাল হয়, তার একটি সূত্র ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু সংলাপের মধ্যে থাকে অনেক ভাব, অনেক ব্যাখ্যার প্রকাশ। কোন কোন সংলাপের অনেক অর্থ-ই হতে পারে। অভিনেতা কোন্ ভাবটি প্রকাশ করতে চাইছেন তার উপরেও 'বিরতি'-র ব্যবহার নির্ভর করে। যেমন,

যুক্তিসম্মত বিরতি

PARDON IMPOSSIBLE SEND TO SIBERIA

এটি একটি টেলিগ্রাম। এই শব্দগুলোর কি অর্থ বুঝবেন ? হয়তো পড়তে হবে—

PARDON (বিরতি) IMPOSSIBLE SEND TO SIBERIA

অথবা

PARDON IMPOSSIBLE (বিরতি) SEND TO SIBERIA

প্রথমটি হ'ল ক্ষমাশীলতার প্রকাশ, দ্বিতীয়টির অর্থ নির্বাসন।

আরেকটি টেলিগ্রামে লেখা আছে ঃ

DO NOT COME TOO LATE

একটি প্রাইভেট কোম্পানি থেকে একজন চাকুরী প্রার্থীকে টেলিগ্রামটি পাঠান হয়েছিল। যিনি টেলিগ্রামটি পেলেন, তিনি পড়লেন— 'বেশী দেরী না করে তাড়াতাড়ি চলে এস'

অনেক পয়সা খরচ করে বোম্বেতে দৌড়ে গিয়েছিলেন ইণ্টারভিউ দিতে। কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনলেন টেলিগ্রামটিতে একটি ফুলস্টপ দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। আসলে ওটি পড়তে হবে—

DO NOT COME (বিরতি) TOO LATE

যাকে খুঁজছিলাম তাকে পেয়ে গেলাম। রবিবারের সকাল। বাজার করে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর দিয়ে '৩৪-এর সি' প্রাইভেট বাসটি তিন নম্বর সরকারী ডবলডেকার বাসটিকে ঝড়ের বেগে ওভারটেক করে চলে গেল। দু'জন মধ্যবয়স্ক লোক রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়লেন। তার মধ্যে একজন ঝাড়া তিন মিনিট ভয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্যজন বলে উঠলেন, 'এই কারণেই তো এ্যাক্সিডেণ্ট হয়।' একপাশ দিয়ে একজন মোটামত লোক থপ্‌থপ্‌ করে ভুঁড়ি নাচিয়ে হেঁটে গেলেন। অন্যদিক দিয়ে একজন রোগা লোক হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন। খুব সতর্কভাবে রাস্তার দু'দিকে চোখ রাখতে রাখতে পা টিপে টিপে বাড়ি ফিরলাম।

এখানেও দেখি উনি আছেন। মিছিল চলেছে মহাজাতি সদন থেকে চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু ধরে রাজভবনের দিকে। পাশাপাশি একটু ফাঁক রেখে দু'টো লাইনের মাঝখানে যেতে যেতে ডান হাত নেড়ে একজন শ্লোগান দিচ্ছেন 'ই-ন্‌-কি-লা-ব'—বাকীরা সবাই একসাথে বলছেন, 'জি-ন্দা-বা-দ'। লাইন বজায় রেখে একঝাঁক বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছিল সবাই। সামনে দুটো লোকের হাতে ফেস্টুন, কয়েকজনের হাতে চাটাই-এর উপর কাগজ মারা পোস্টার। মিছিল এগিয়ে চলেছে এঁকে-বেঁকে।

কিন্তু এই জায়গায় ওকে দেখব ভাবতে পারিনি। রাত ৮টা। বনগাঁ লোকালের একটি কামরা। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাগজোলা সিগন্যালের কাছে। ভেতরে লাইট নেই, ফ্যান নেই। গরমে হাঁসফাঁস করছেন সবাই। তারই মধ্যে—

—ডবল লাইন আর কবে হবে মশাই!

—চুপচাপ বসে না থেকে টুকটাক্ মুখ চালান। আনারস, কমলালেবু—মিষ্টি-মিষ্টি, টক-টক। পাঁচ পয়সায় একটা, দশ পয়সায় দু'টো।

—গলার হারটা সাবধান। যা চুরি-ছিনতাই হচ্ছে চারদিকে।

—আমার ছাগলটার যে কি হল!

—দাদা, সিগন্যাল দিল ?

আশ্চর্য ! এখানেও বস্তুটি হাজির ! টাইগার হিল থেকে সূর্য ওঠা দেখছি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ক্যামেরাটি ঠিক করে নিলাম। কোন্ অতল গহ্বর থেকে সূর্যটি উঠছে বুঝতে পারছি না। সারাটি আকাশ জুড়ে লাল রং নিয়ে আবির খেলা চলেছে, মাঝে মাঝে বেগুনি আর সবুজের সমারোহ। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োতে একটি নীল আলোর ছটা নেচে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে চলে গেল এভারেষ্ট-এর মাথায়। মেঘের আড়াল দিয়ে সূর্যটি টুক্ করে উঠে পড়ল অনেকটা উপরে—একটি সুন্দর সকালের প্রতিশ্রুতি।

বস্তুটি কি ? কাকে খুঁজে পেলাম ? কে সব জায়গায় রয়েছে ? —ছন্দ। প্রাইভেট বাসটির ঝড়ের বেগে যাওয়ার মধ্যে একটি ছন্দ আছে। ঐ দু'জন লোকের লাফ দিয়ে ফুটপাতে ওঠবারও একটি ছন্দ আছে। মোটা লোকটির ভুঁড়ি নাচিয়ে থপ্‌থপ্ করে হাঁটা, রোগা মানুষটির হন্‌হন্ করে হাঁটা, আমার সতর্ক হয়ে পা টিপে টিপে বাড়ি ফেরা, মিছিলের চলার গতি, 'ই-ন্-কি-লা-ব—জি-ন্দা-বা-দ' শ্লোগান, হকারের লজেন্সের প্রচার কৌশল, ট্রেনের যাত্রীদের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা, আকাশে রং-এর আবির খেলা, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োতে আলোর ছটা নেচে ওঠা—সব কিছুর মধ্যেই ছন্দ আছে।

মজা এই যে, ছন্দ না থাকাটিও একটি ছন্দ। দ্বিতীয় জনের চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা, বনগাঁ লোকালের বাগজোলা সিগন্যালেব কাছে থেমে থাকা, পাহাড়, আকাশ—এদের মধ্যেও ছন্দ আছে।

—জীবনীশক্তির স্বাভাবিক প্রকাশের জন্য যে প্রবাহ ও গতির দরকার হয় তাই ছন্দ। জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে ছন্দ। শক্তিকে সংযত, সংহত ও একাগ্র করে তোলে ছন্দ। অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পী ও ক্রীড়াবিদের কাছে তাই ছন্দের মূল্য অপরিসীম। এজন্যই চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পে গাছ, পাহাড়, সমুদ্র, ধানক্ষেত বা আকাশ সৃষ্টির সময় অথবা রঙের ব্যবহারের সময় ছন্দের কথা না ভেবে পারা যায় না।

আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম (বিরতি)। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান--
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে (বিরতি)।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি
বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই ॥

[কর্ণকুন্তিসংবাদ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

প্রথম পর্যায়ে কর্ণ কুন্তিকে আশ্বাস দিচ্ছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে ভাবছেন। তৃতীয় পর্যায়ে মিনতি বা অনুরোধ, চতুর্থ পর্যায়ে অভিমান ও সর্বশেষে আশীর্বাদ প্রার্থনা। প্রত্যেকটি ভাব প্রকাশের আগে বিরতি-র ব্যবহার করা হয়েছে।

২। ঔরংজীব ॥ যা করেছি—ধর্মের জন্য। (বিরতি) যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হ'ত (বিরতি) [বাহিরের দিকে চাহিয়া] উঃ কি অন্ধকার ! (বিরতি) কে দায়ী ? (বিরতি) আমি ! (বিরতি) এ বিচার, ও কি শব্দ ? (বিরতি) না বাতাসের শব্দ (বিরতি) এ কি ! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন

থেকে দূর কর্ত্তে পাচ্ছি না। (বিরতি) রাত্রে তন্দ্রায় ঢ'লে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না [দীর্ঘনিশ্বাস] (বিরতি) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! (বিরতি) [পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া] ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির? (বিরতি) সুজার রক্তাক্ত দেহ! (বিরতি) মোরাদের কবন্ধ! (বিরতি) যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ (বিরতি) ঐ তা'রা আবার আমায় ঘিরে নাচছে! (বিরতি) কে তোমরা?

[সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

এখানে ঔরংজীবের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। কোন সময় তিনি নিজের বিবেকের কাছে দারাকে হত্যা করার জন্য যুক্তি দিচ্ছেন, কোন সময় তার মনে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে, পরমুহূর্তেই উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি—দারার মুণ্ড, মোরাদের কবন্ধ ও সুজার হাসি দেখতে পাচ্ছেন।

সক্রিয় বিরতি

নাটকে থাকে এ্যাকৃশন্। দেহভঙ্গি ও চলাফেরা ছাড়া আলো বা শব্দক্ষেপণের সাহায্যেও নাটকে এ্যাকৃশন্ তৈরী হতে পারে। সংলাপ বলার মধ্যেও ঠিক এমনি এ্যাকৃশন্ তৈরী হয়, আব এই এ্যাকৃশন্‌কে সক্রিয় করার জন্য বিরতি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সংলাপ বলার সময় অতীতে ঘটে গিয়েছে এমন কোন ঘটনা অথবা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য একটি ছবি বা ভাবকে মুহূর্তে যদি বিশ্বাসযোগ্য করে দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে চান তবে আপনি বিরতি-কে চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

উদাহরণ :

১। নীলমনি ॥ তোর বৌদি মরে গেল (বিরতি) ছেলেটাকে মামার বাড়িতে রেখে মানুষ করতে লাগলুম। (বিরতি) আমি তখন এলাহাবাদে বাউণ্ডুলের মত ঘুরছি (বিরতি) Contractory-র কাজ করতুম, রোজগার শুধু ঐ ছেলের জন্যে। (বিরতি) তারপর ছেলে মানুষ হয়ে একদিন চিঠি

লিখলো, 'বাবা, তুমি ফিরে এসো, আমরা দু'জনে বাপ-বেটায় একজায়গায় থাকবো।' উঃ সেদিন যে কি আনন্দ হয়েছিল ভোলা কি বলবো (বিরতি) নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, ছেলের কাছে চলে এলুম (বিরতি) তারপর ছেলে love marriage করলে (বিরতি) আমার তাতে কি, ও যাতে সুখী হবে তাই করুক (বিরতি) তারপর বৌমা এল (বিরতি) বুঝলি ভোলা, আমি যেন আবার সংসারী হ'য়ে গেলুম··· দু'বেলা বাজার-হাট করতুম, বৌমার ফাইফরমাশ খাটতুম, আমার বেশ লাগতো (বিরতি) তারপর ভাবতুম আমার নাতি হবে (বিরতি) আমি নাতিকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবো, (বিরতি) নাতি আমায় দাদু ! দাদু ! বলে ডাকবে।

[শেষ থেকে শুরু—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়]

এখানে 'বিরতি' নীলমণির অতীতের সুখ-দুঃখের ছবিগুলোকে একটির পর একটি ছায়াছবির মত সাজিয়ে দিচ্ছে। তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন এ্যাক্‌শন্‌। দর্শকের মনেও একটি নিটোল চিত্রকল্প ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে।

২। ভোলা ॥ আমি এখন মাঝে মাঝে ভাবি (বিরতি) আমি বেশ মরে গেছি (বিরতি) একটা ভালো দড়ির খাটে শুইয়ে দিয়েছো (বিরতি) কপালে ফোঁটা-ফোঁটা চন্দন দিয়েছো (বিরতি) আমার শক্ত ঘাড়টাকে একটু উঁচু করে দিয়ে তুমি ছবি তুলছো (বিরতি) ভোলাতো নেই (বিরতি) একলাকেই সব করতে হচ্ছে (বিরতি) তুমি কিছুতেই ফোকাস করতে পারছ না দাদা (বিরতি) ক্যামেরার কাঁচ কেবলই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তোমার চোখের জলে।

[শেষ থেকে শুরু—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়]

এখানে 'বিরতি' ভোলার ভবিষ্যতের কাল্পনিক ছবিটি একটু একটু ক'রে তুলে ধরছে আর সঙ্গে সঙ্গে সংলাপের মধ্যে এ্যাক্‌শন্‌ বাড়িয়ে চলেছে—নাট্যমুহূর্ত তৈরী হচ্ছে।

ব্যাখ্যানমূলক বিরতি

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে প্রতিভাত করার জন্য 'বিরতি'-র ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ ঃ

বাবা ॥ খোকা, আমি যে কত কঠিন তা' তুমি জান। তুমি জান যে, আমি কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—(বিরতি)—খোকা তুই বিপথে গেলে আমার বড় কষ্ট হয়।

পিতার চারিত্রিক কাঠিন্যের আড়ালে সন্তানের জন্য হৃদয়ে যে কোমল জায়গাটি আছে বিরতি-র সাহায্যে তার প্রকাশ করা হয়েছে।

বয়স বোঝাতে বিরতি

সত্তর বছরের বৃদ্ধ কথা বলার সময় যে বিরতি-র সাহায্য নেবেন, কুড়ি বছরের যুবক নিশ্চয়ই তত বিরতি ব্যবহার করবেন না। অবশ্য ভগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা ও যে পরিবেশে চরিত্রটি মানুষ, তার উপরও এ-ব্যাপারটা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ছন্দোময় বিরতি

উদাহরণ ঃ

দীপক ॥ সঞ্জু,— সঞ্জু—

সঞ্জয় ॥ এ্যাঁ—(বিরতি)—হ্যাঁ—(বিরতি)— কি বলছিস।

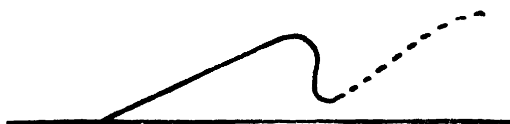
হাসির দৃশ্যে বিরতির ভূমিকা

হাস্যরস সৃষ্টির সময় বিরতির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ধরুন, একটি হাসির কথায় দর্শকরা খুব হাসছেন। হাসিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। এখানে কি করবেন ? ঐ হাসির মধ্যেই সংলাপ বলে যাবেন ? না, কখনই তা করবেন না। কারণ, প্রথমতঃ হাসির শব্দে সংলাপ শোনা যাবে না অথচ ঐ কথাগুলোই হয়ত চরিত্র বা দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ পরের সংলাপটিও যদি হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে সেটিও

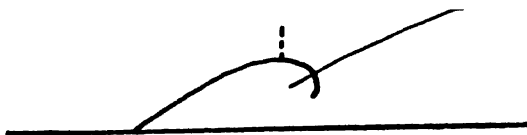
নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে অপেক্ষা করতে হবে। হাসি থামলে বা কমলে সংলাপ বলতে হবে। অর্থাৎ, এখানেও একধরনের থেমে থাকা বা বিরতি কাজ করছে। তবে দর্শকের হাসি কতটুকু কমলে বা হাসি থামার পর কতটুকু সময় বিরতি দেবেন, সেটি অনেক দিন অভিনয় করতে করতে ধারণায় এসে যায়। আবার উপস্থিত দর্শকদের মেজাজ, মনোযোগ, শিক্ষা ও হাস্যরস গ্রহণ ক্ষমতার উপরও এটি অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ নাটকের প্রথম দিকে উৎকণ্ঠা ও জিজ্ঞাসার চাপে দর্শকের মনোযোগ নীচের রেখাচিত্রের মত কেন্দ্রীভূত হ'তে থাকে।



কিন্তু যে মুহূর্তে একটি নীরবতা বা বিরতি আসে তখনই উত্তেজনার রেখাটি একটু একটু করে নীচের দিকে নামতে থাকে। আবার পরবর্তী সংলাপ শোনার সাথে সাথে উপরের দিকে উঠতে থাকে।



সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, বিরতি দেবার পর যে মুহূর্তে বোঝা যাবে যে দর্শকরা সংলাপের অর্থটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তখনই পরবর্তী সংলাপটি বলে ফেলা।



এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন—বিরতির সময় অভিব্যক্তি কিন্তু কখনই নিষ্ক্রিয় থাকবে না।

উদাহরণ ঃ

শ্যামল মদের আসরে মশগুল। এমন সময় তার বন্ধু অভি এসে বললো—

অভি ॥ শ্যামল বাড়ি চল্।

শ্যামল ॥ বাড়ি—কোন্ বাড়ি—কার বাড়ি—আমার কোন বাড়ি নেই—

অভি ॥ শ্যামল তোর বাবা মারা গেছেন।

শ্যামল ॥ কে বাবা—কার বাবা—(বিরতি)—না—(কান্না)

এখানে বিরতির সময়টুকুতে অভিব্যক্তি কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় থাকবে। ঘটনার আকস্মিকতা সংলাপকে স্তব্ধ করে দিলেও শ্যামলের মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্তরগুলো এই মুহূর্তে তার চোখ ও মুখের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ফুটে উঠবে।

এম্‌ফ্যাসিস্‌

এম্‌ফ্যাসিস্‌

সুন্দর ও বেগবান বাচনভঙ্গির পক্ষে এম্‌ফ্যাসিস্‌ একটি অভিনব পদ্ধতি।

— পিটার ক্যাপন্‌

এম্‌ফ্যাসিস্‌ ব্যবহারের দু'রকম কার্যকারিতা আছে : খুব সহজে এবং দুলিয়ে সংলাপগুলোকে বলা যায় ; সংলাপগুলোকে অধিক অর্থবহ, আবেগময় ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

— মারটিন ফারকুয়ার টুপেপ্‌

অতিরিক্ত এম্‌ফ্যাসিস্‌ শ্রুতিকটু এবং একটি নির্দিষ্ট ভাবপ্রকাশক শব্দ সমষ্টির মধ্যে অনেক শব্দের উপর এম্‌ফ্যাসিস্‌ দিলে তা খুব কম শব্দের উপর এম্‌ফ্যাসিস্‌ দেয়ার মতই একঘেয়েমি মনে হয়।

-- গোয়েনেথ থারবার্ণ

এম্‌ফ্যাসিস্‌ শব্দটির সঠিক সংজ্ঞা পাওয়া শক্ত। কারণ ন্যায়-নীতি বা ব্যাকরণের দিক দিয়ে অর্থবহ কোন শব্দের উপর জোর নিক্ষেপ করাই শুধু এর অর্থ নয়। এ তার চেয়েও বেশ কিছুটা বেশী।

— অহীন্দ্র চৌধুরী

কোন শব্দকে প্রাধান্য দিতে হলে সাধারণতঃ সেই শব্দটির উচ্চারণে স্বর-গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। বৈপরীত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই শব্দ প্রাধান্য (Word-emphasis) খুবই কার্যকর হতে পারে।

— ভূষণ রায়

সর্টপিচ বা বাম্পার বলকে ঠিক সময়ে ব্যাটের ঠিক জায়গা দিয়ে হিট করলে যেমন ওভার বাউণ্ডারী পাওয়া যায়, তেমনি ঠিক শব্দটির উপর ঠিক মতো জোর দিলে সংলাপের বিশেষ অর্থটিকে খুব সহজেই দর্শকদের বোঝান যায়।

উদাহরণ ঃ

'আমি জানি যে তুমি তোমার লাল জুতো জোড়া পছন্দ কর'।

প্রথমে, **আমি** জানি যে তুমি তোমার লাল জুতো জোড়া পছন্দ কর।
অর্থ ঃ আপনি জানেন কিন্তু অন্যেরা নাও জানতে পারে।

অথবা, **আমি জানি** যে তুমি তোমার লাল জুতো জোড়া পছন্দ কর।
অর্থ ঃ আপনি আপনার এই জানার কথাটি হলফ করে বলছেন।

অথবা, আমি জানি যে **তুমি** তোমার লাল জুতো জোড়া পছন্দ কর।
অর্থ ঃ শ্রোতা পছন্দ করতে পারে কিন্তু অন্যেরা নাও করতে পারে।

অথবা, আমি জানি যে তুমি তোমার লাল জুতো জোড়া **পছন্দ কর**।
অর্থ ঃ শ্রোতার পছন্দটি অবস্থা অনুযায়ী যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে।

অথবা, আমি জানি যে তুমি **তোমার** লাল জুতো জোড়া পছন্দ কর।
অর্থ ঃ অন্যের লাল জুতো শ্রোতার পছন্দ নাও হতে পারে।

অথবা, আমি জানি যে তুমি তোমার **লাল** জুতো জোড়া পছন্দ কর।
অর্থ ঃ অন্য রঙ শ্রোতার পছন্দ হবেই এটা জোর করে বলা যাচ্ছে না।

অথবা, আমি জানি যে তুমি তোমার লাল **জুতো জোড়া** পছন্দ কর।
অর্থ ঃ অন্য কোন লাল জামা বা জিনিস শ্রোতার নাও পছন্দ হতে পারে।

বেশীরভাগ সময় একটি সংলাপের মধ্যেই পর পর দু'টি বা তিনটি শব্দের উপর জোর দিতে হতে পারে, যেমন—

'কত **রক্ত অবক্ষয়**
পার হয়ে **ভীষণ সংশয়**
পাওয়া যায় কোন এক
পরিপূর্ণ **নিটোল প্রত্যয়**'

অথবা

যোগ বিয়োগের অঙ্কে শূন্য
তবু শেষ শূন্য নয়
কোথাও নিহিত যেন পূর্ণ মূল্যে
প্রার্থনার গান।'

অথবা

'ইতিহাস কথা বলে
ঝরে পড়ে অন্ধকার দিনের প্রত্যয়
তবু সব অন্ধকার হয়তো বা
অন্ধকার নয়।"

[এখন যুদ্ধ—প্রণব মিত্র]

এম্‌ফ্যাসিস্‌-এর ব্যবহার অন্যভাবেও হতে পারে, যেমন—

বিরতি ব্যবহার করে

যে শব্দ বা শব্দসমষ্টির উপর এম্‌ফ্যাসিস্‌ দিতে চাইছেন তার আগে যদি একটি ছোট বিরতি দেন তবে ভলিউম না বাড়িয়েই এম্‌ফ্যাসিস্‌-এর কাজটি করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের শেষ অধ্যায়টি ধরা যাক ঃ

সুধা ॥ অমল।
রাজ কবিরাজ ॥ ও ঘুমিয়ে পড়েছে।
সুধা ॥ আমি যে ওর জন্য ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না।
রাজ কবিরাজ ॥ আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।
সুধা ॥ ও কখন জাগবে ?
রাজ কবিরাজ ॥ এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।
সুধা ॥ তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে ?
রাজ কবিরাজ ॥ কি বলবো ?

সুধা ॥ বোলো যে (এইবার পরবর্তী শব্দগুলোকে জোরালো ও বিশেষ অর্থবহ করার জন্য অল্পক্ষণ বিরতি দিন, তারপর বলুন) সুধা তোমাকে ভোলেনি।

একটি শব্দকে উঁচু স্বরগ্রামে তুলে

১। 'আকাশের রং হলুদ, সবুজ বা লালও নয়, আকাশের রং **নীল**।'

২। 'আপনি কি তা'হলে বলতে চান আমার খসড়াটি **ভুল**?'

এম্‌ফ্যাসিস্‌ দেবার জন্য 'নীল' ও 'ভুল' শব্দদু'টি পঞ্চমে বা সপ্তমে তুলে উচ্চারণ করতে পারেন।

শব্দকে দীর্ঘায়িত করে বা দুলিয়ে

'মুন্নি একটি ছোওওওওট্ট মেয়ে'

যদি 'মেয়ে' শব্দটির উপর জোর দিতে চান তবে বলবেন,

'মুন্নি একটি ছোট্ট মেএএএয়ে

অথবা

'হায়রে আর সঅঅঅব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়েনা'।

[রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

অথবা

আমি প্রকাআআআণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোওওওট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, রিক্ত, আমি ক্লাআআআন্ত।

[রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

হাস্যরস সৃষ্টির কাজেও এম্‌ফ্যাসিস্-এর এরকম ব্যবহার খুবই প্রচলিত। যেমন—

'অঅঅঅসভ্য'— [ফেরারী ফৌজ—উৎপল দত্ত]

অথবা

'আমি কিছু বলব নাআআ'— [ব্যারিকেড—উৎপল দত্ত]

গুরুগম্ভীর মুহূর্তেও এ-পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। যেমন—

'নন্দিনীইইইইইইই'— [রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সংলাপ আরম্ভ করে পরে ধীরগতিতে বলে

যে শব্দগুলোর উপর জোর দিতে চাইছেন তার ঠিক আগের সংলাপগুলো অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে বলুন, তারপর ধীরগতিতে পরের সংলাপগুলো বলুন। এম্‌ফ্যাসিস্-এর এই পদ্ধতির আসল রহস্যটি হ'ল, যত দ্রুতগতিতে কথা বলা হবে ততই সংলাপের উপর জোর কমতে থাকবে, অপরপক্ষে ধীরগতিতে সংলাপ বললে শব্দগুলোর অর্থ জোরালোভাবে প্রকাশ করা যাবে। তাছাড়া প্রথমে দ্রুতগতি ও পরে ধীরগতির এই পাশাপাশি অবস্থানে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং সেখানেই সাফল্য।

উদাহরণ :

চাণক্য ॥ চন্দ্রগুপ্ত !

চন্দ্রগুপ্ত ॥ গুরুদেব !

চাণক্য ॥ উর্দ্ধে চাও দেখি।—কি দেখ্‌ছো ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ আকাশ।

চাণক্য ॥ কি বর্ণ ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ পাংশুরক্তবর্ণ।

চাণক্য ॥ কি বুঝ্‌ছো ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ ঝড় উঠ্‌বে।

চাণক্য ॥ ঠিক ! ঝড় উঠ্‌বে। আর সম্মুখ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি ! কিছু দেখতে পাচ্ছ না ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ না !

চাণক্য ॥ অন্ধ ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে।—এ কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবল নয়, পরশুরামের শৌর্য্য নয়, বামনের ছলনা নয়।

(এই পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে বলে. পরের সংলাপগুলো ধীরগতিতে বলুন)

এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি। স্বর্গমর্ত্য এক সঙ্গে !

(আবার দ্রুতগতিতে বলুন)

আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত ! ওঠো—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখ্‌ছি জানো ?

চন্দ্রগুপ্ত ॥ কি গুরুদেব !

চাণক্য ॥ এই প্রধূমিতা প্রজ্জ্বলিতা প্রবাহিতা রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য !

(এরপর আবার ধীরগতিতে বলুন)

সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য !

[চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

বিশেষ সুর ব্যবহার করে

উদাহরণ ঃ

'করুণা ॥ বরেনবাবু !—আপনি পোর্টব্লেয়ারে গেছেন ?

বরেনবাবু ॥ এই নাও। এত জায়গায় গেছি আর পোর্টব্লেয়ার যাইনি ! সে তো ঘরের কাছে মা, আন্দামানে।

করুণা ॥ গেছেন ?

বরেনবাবু ॥ নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন বলত করুণা। তুমিও কি আমার মত জাহাজ-টাহাজ চালাও নাকি ?

করুণা ॥ ঐরকমই একটা কিছু।

বরেনবাবু ॥ অঃ। **বুঝিছি**। বুড়োর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। পোর্টব্লেয়ারে একজন আছে, আর তার কোন খবর পাচ্ছনা, তাইতো !'

[ছুটির খেলা—অমিতা রায়]

এখানে 'বুঝিছি' শব্দটিকে এক বিশেষ সুরে বলে এম্‌ফ্যাসিস্‌ তৈরী করা হয়েছে।

শব্দকে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে

উদাহরণ ঃ

১। আ-আ-আছ্‌-ছা ২। এ-এ-এ-এই কথা

হঠাৎ নীচু স্বরগ্রামে বলে

কপট অভিনয়, প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গ বা সহজ প্রহসনের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্য স্বরগ্রামকে হঠাৎ নীচুতে নামিয়েও এম্‌ফ্যাসিস্‌ করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর 'সাজাহান' নাটকে জাহানারা-র তীব্র আক্রমণে যখন সমস্ত পরিবেশ ঔরংজীব-এর বিরুদ্ধে, সেই সময়কার ঔরংজীব-এর বাক্‌চাতুর্য ও কপট অভিনয়ের কথা ধরা যাক ঃ

ঔরংজীব ॥ উত্তম ! তবে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্লাম ! সভাসদ্‌গণ ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎই সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, যে দারা সম্রাট্‌ হোন্‌, বলুন, আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন ? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই

সিংহাসনে বসতে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই [এইবার স্বরগ্রামকে হঠাৎ নীচুতে নামিয়ে বলুন] একদিকে দারা—আর এক দিকে সুজা আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে' কেউ সিংহাসনে বসতে চান, বসুন।

অথবা

শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার'—যেখানে এ্যাণ্টনি রোমের জনগণকে ব্রুটাসের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন—

এ্যাণ্টনি ॥ বন্ধুগণ, রোমের অধিবাসীবৃন্দ, আমার স্বদেশবাসীগণ। ব্রুটাস ও অপরাপর সকলের অনুমতিক্রমে আমি এখানে এসেছি সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে কিছু বলবার জন্য। ব্রুটাস একজন মহামান্য ব্যক্তি, ব্রুটাস বলেছেন, সীজার ক্ষমতালোভী ছিলেন। সীজার বহু যুদ্ধবন্দীকে বিদেশ থেকে রোমে নিয়ে এসেছেন, তাদের মুক্তিপণে রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। দরিদ্ররা যখনই অশ্রু-বিসর্জন করেছে, সীজারও তাদের সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেছেন। ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তির হৃদয় এর চেয়ে কঠিনতর উপাদানে তৈরী হওয়া উচিত। তথাপি ব্রুটাস বলেছেন, তিনি নাকি ক্ষমতালোভী ছিলেন, আর [এইবার একটু থেমে স্বরগ্রামকে একটু নীচুতে নামিয়ে এম্‌ফ্যাসিস্-এর প্রয়োগ করুন] ব্রুটাস নিশ্চয়ই একজন অতি সম্মানীয় ব্যক্তি। [আগের স্বরগ্রামে ফিরে গিয়ে] আপনারা সবাই দেখেছেন, লুপারক্যাল উৎসবের সময় আমি তিন তিনবার তাঁকে রাজমুকুট উপহার দিতে চেয়েছি—তিন তিনবার তিনি তা' প্রত্যাখান করেছেন। একে কি ক্ষমতালোভ বলে? তবু ব্রুটাস বলেন, তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন, আর [আবার এম্‌ফ্যাসিস্-এর প্রয়োগ করুন] —ব্রুটাস যে একজন মহামান্য ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে একটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। স্বরগ্রামকে হঠাৎ নীচুতে নামিয়ে বলার সময় সংলাপ যেন অশ্রুত না হয়। ছবি আঁকার মধ্যে

আলোছায়ার যেমন একটি সাযুজ্য থাকে, তেমনি যে সংলাপগুলোতে এম্‌ফ্যাসিস্-এর ব্যবহার হচ্ছে তার সঙ্গে যে সংলাপগুলোতে এর ব্যবহার হচ্ছে না, এ'দুয়ের মধ্যে যেন একটি সামঞ্জস্য থাকে, একটি সঙ্গতি থাকে।

এম্‌ফ্যাসিস্ ব্যবহারের সর্ত

১। নাট্যকার সংলাপের মধ্যে যে অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেটি বুঝে তবেই এম্‌ফ্যাসিস্ প্রয়োগের পথে পা বাড়াবেন, তার আগে নয়।

২। শব্দের উপর বিশেষ জোর দিতে গিয়ে সংলাপ বলাটি যান্ত্রিক না হয়ে পড়ে, স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত না হয়।

৩। অতিরিক্ত এম্‌ফ্যাসিস্ ব্যবহার করলে শ্রুতিকটু ও বিরক্তিকর হতে বাধ্য। খুব কম এম্‌ফ্যাসিস্-এর ব্যবহার যেমন সংলাপের মধ্যে একঘেয়েমি এনে দেয়, তেমনি খুব বেশী এম্‌ফ্যাসিস্-এর ব্যবহারও ভালো নয়।

৪। ভুল শব্দের উপর এম্‌ফ্যাসিস্ করলে ফল কিন্তু ঠিক উল্টো হবে, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

গতি

গতি

প্রতিটি ছত্র এমনভাবে বলতে হবে যাতে এর মধ্যে নিহিত গূঢ় অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু এটি করার সময় গতিকে কিছুতেই পরিহার করা উচিত নয়। গতিময়তা শুধু দ্রুততার অনুশীলন হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয়, নাটকীয় উদ্দেশ্য ও দ্রুততার সুসঙ্গতি থাকা চাই।

— জে. ক্লিফোর্ড টারনার

গতির উৎকর্ষতা সংলাপের কল্পনাশক্তিপূর্ণ প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে একমাত্র নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসেই গতির এই উৎকর্ষতা আসতে পারে।

— গোয়নেথ থারবার্ন

দ্রুত 'গতিভঙ্গি' আর দ্রুত উচ্চারণ এক জিনিস নয়। 'গতিভঙ্গি'কে কাজে লাগাতে গিয়ে শব্দকে পদদলিত হতে দেওয়াটা কল্পনাও করা যায় না।

— প্রবোধবন্ধু অধিকারী

সঙ্গীতের মতই কথার মধ্যে গতির তাড়া জাগিয়ে দেয় ছন্দ। আর এই গতির তাড়া জেগে উঠলেই, এমনিতে যাকে খুব সহজ কথা বলা হয়, তার চেহারাটা কেমন পাল্টে যায়। নিতান্ত আটপৌরে কথাগুলোও তখন কেমন আশ্চর্য এক রহস্যের ছোঁয়ায় যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গাড়ি চালাবার সময় একজন ড্রাইভার যেমন রাস্তার বাঁকের কাছে গাড়িকে ধীরে চালান, ফাঁকা রাস্তা পেলে জোরে চালান, বাম্পার থাকলে গীয়ার পাল্টে নতুন গতি আনেন, তেমনি ভাবের তীব্রতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী সংলাপ বলার গতি কখনও বাড়াতে হয়, কমিয়ে আনতে হয় অথবা মাঝারি গতিতে বলতে হয়।

গতিকে অনেকে তুলনা করেন নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে। নাড়ীর স্বাভাবিক স্পন্দন যে গতিতে হয়, সেই গতিকে তাঁরা মধ্যগতি মানেন; তার অর্ধেককে বিলম্বিত এবং মধ্যের দ্বিগুণ গতিকে বলেন দ্রুত।

কোন কিছুর বর্ণনা দিতে গেলে, উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা অথবা উত্তেজনার মুহূর্তে আমরা সাধারণতঃ দ্রুতগতিতে কথা বলি। কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গেলে, কৈফিয়ত দিতে গেলে ধীর গতিতে কথা বলি। লঘু, চঞ্চল, আনন্দ এবং কাব্যিক সংলাপগুলো সাধারণতঃ দ্রুতগতিতে এবং শান্ত, অচঞ্চল, শ্রদ্ধা, দুঃখদায়ক, সন্ত্রস্ত বা ভয়ংকর রসের সংলাপগুলো ধীরগতিতে বলা হয়। আবেগহীন সংলাপ মাঝের গতিতে বলা হয়।

ধীরে ধীরে কথা বলার গতি বাড়ালে একটি চাপা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব। অনুরূপভাবে দ্রুতগতি থেকে ধীরগতিতে কথা বলে চরিত্রের অলসতা, অসুস্থতা বা শারীরিক দুর্বলতার প্রকাশ সম্ভব।

অনুশীলনী :

সংলাপ

'তোমরা কি অবাক হয়ে ভাবছ যে আমি কে—বা আমি কি করি? তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে আমার কথা শোনেনি—এবং আমি এখানে কেন এসেছি—তা জানে না? কেউ নেই? যদি এরকম কেউ থাক, তাহলে বল। কি, কেউ নেই? তাহলে তোমরা সবাই জান যে আমি কে? তাই যদি সত্যি হয় খুব ভাল কথা। এবং এটাই হওয়া উচিত। যাই হোক, ধরো যদি এমন হয় যে তোমাদের মধ্যে আজ এমন একজন আছো যে আমাকে জানো না, চেনো না, আমার কথা কোনদিন শোনো নি, তাহলে কি হবে? আবার কি শুধু তারই জন্য আমার পরিচয় নতুন করে বলতে হবে।

১) কোন বিরতি না দিয়ে প্রথম দু'টি বাক্য যত দ্রুত সম্ভব পড়ুন। এবার 'কেউ নেই' বলার আগে দীর্ঘ সময়ের 'বিরতি' দিন। আবার দ্বিতীয় 'কেউ নেই' বলার আগে আরো দীর্ঘ সময় 'বিরতি' দিন। এরপর পরের তিনটি বাক্য দ্রুতগতিতে বলুন। শুধু শেষের বাক্যটি ধীরগতিতে বলবেন।

অথবা

২) প্রথমে মাঝারি গতিতে সংলাপটি বলা শুরু করুন। তারপর ধীরে ধীরে বলার গতি এমনভাবে বাড়িয়ে চলুন যাতে 'তোমরা সবাই জান যে আমি কে' সংলাপটিতে এসে শেষবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছয়। এরপর থেকে পরের বাক্যগুলো বলার সময় গতি কমিয়ে আনতে থাকুন। এমনি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বাড়ানো-কমানো মিলিয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ক্লাইমেক্স-এ গিয়ে পৌঁছতে পারছেন ততক্ষণ একবার গতি বাড়িয়ে, একবার কমিয়ে বলতে থাকুন।

সুর

সুর

সারাটি সন্ধ্যা বসে সুরহীন সংলাপ শোনা কোনো দর্শকের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়।

— জন গিলগুড

বর্ণময়তা অথবা মাঝে মাঝে যাকে কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন বা সুর বলা হয়, তার জন্য, সূচীশিল্পের মত, কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতার প্রয়োজন।

— ম্যাল্কম মরিসন

স্বরগ্রামের ওঠানামা এবং সুরের এক পর্দা থেকে আরেক পর্দায় যাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হ'লে যথেষ্ট মঞ্চ-অভিনয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

— ক্রিষ্টাবেল বার্নিসটন

এক একটি বাক্যের এক একটি শব্দ যেন কংকালের অস্থিগুলোর মত ; তাদের কাঠামো আছে, প্রাণ নেই। অস্থিগুলো উষ্ণ মাংস দ্বারা আবৃত করা দরকার, তাদের জীবনদান করতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ীর স্পন্দনের প্রয়োজন। তেমনি সুর হচ্ছে বাক্যের শ্বাস-প্রশ্বাস—স্পন্দন।

— স্যামুয়েল সেল্ডন

অভিনয়ের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য কিংবা আরোহন-অবরোহনের দ্বারা বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় ক্রমাগত বাড়ালে কিংবা কমালে দর্শকচিত্তের মধ্যে কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আবার কণ্ঠস্বর উঁচু থেকে নীচু অথবা নীচু থেকে উঁচু পর্দায় স্থানান্তরিত করলে দর্শকচিত্তে যে আকস্মিক আঘাত লাগে তার ফলে চমৎকার নাট্যরসের সৃষ্টি হয়।

— ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

অভিনেতাকে সুরশিল্পীর মতোই কণ্ঠ সাধনা করতে হবে—যেমন উদারা-মুদারা-তারা তিন গ্রামেই স্বরকে খেলাতে হবে, তেমনি বিচিত্র কণ্ঠস্বরকে নিজের কণ্ঠে ব্যক্ত করতে শিখতে হবে।

— ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য

সুর হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ভাষায় সুর সংযোজন করিতে পারিবেন না ; সুরে সিদ্ধিলাভ না করিলে ভাষায় সুর সংযোজন করিতে পারিবেন না। শ্রোতা যে ভাল মন্দ বিচার করেন, তাহা সুরেরই বশীভূত হইয়া। এখানে সুরজ্ঞ অর্থে গায়ক নয়, এ সুর অর্জন করিতে হয় ধারনায়, চিত্তবৃত্তির দ্বারা।

— ফনীভূষণ বিদ্যাবিনোদ

হারমোনিয়ামে যাকে ক্রোম্যাটিক স্কেল বলে, অর্থাৎ সা ঋ রে জ্ঞা গা, অর্থাৎ প্রত্যেকটা পরপর পর্দার ওপর গলাটা চালিয়ে ব্যায়াম করা। এবং মীড়। ধরা যাক সা থেকে গা-য়ে যাবে গলাটা, কিন্তু অন্তর্বর্তী সময় পর্দাগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এইভাবে ব্যায়াম করতে করতে অন্তর্বর্তী শ্রুতিগুলো কণ্ঠে সাবলীল হয়।

— শম্ভু মিত্র

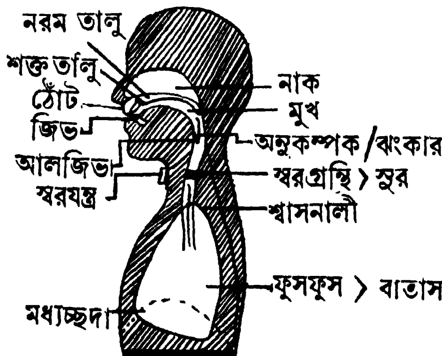
গলা তুলবার সময়ে সুর তুলতে হয়। যে ষড়জে অভিনেতা কথা কইছেন, চেঁচাতে গেলে সেই সপ্তকের মধ্যম বা পঞ্চমে যেতেই হবে। অন্যথায় একই পর্দায় চেঁচালে আওয়াজও বাড়ে না, অভিনেতার গলায়ও লাগে চোট। সুতরাং গলায় সুর না খেললে কোনদিনও ভলিউম তোলা যাবে না।

— উৎপল দত্ত

সংলাপ বলাটি ছবি আঁকার মত। চিত্রশিল্পী কখনও সবুজ রং ব্যবহার করেন, কোথাও বাদামী বা লাল অথবা একটি রং-এর সঙ্গে আরেকটি রং—তার উপর আরেকটি রং মিশিয়ে মিশিয়ে ক্যানভাসের উপর ভাবের ছন্দ তৈরী করেন। সংলাপ বলার মধ্যেও তাই, অভিনয় শিল্পী নানা সুরের সমন্বয়ে ঝংকার তোলেন, সুরের ভাষাতে চরিত্রের শ্রদ্ধা, আনন্দ, গর্ব, কৌতূহল, বিষণ্নতা, ক্লান্তি, প্রতিজ্ঞা ও মানবমনের শত-সহস্র অনুভূতি প্রকাশ করেন।

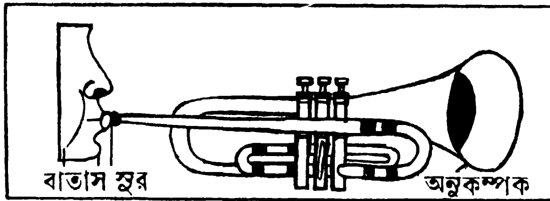
আসলে মনের মধ্যে একটি ভাব চাড়া দিয়ে উঠলেই কণ্ঠের দরজায় তার প্রতিঘাতে একটি না একটি সুরের তরঙ্গ উঠবেই। এটিই স্বাভাবিক, এটিই নিয়ম। আমরা তন্ময় হয়ে যখন কিছু আলোচনা করি, ভাবাবিষ্ট হয়ে কিছু বলি, ক্রোধাদি রিপুর বশবর্তী হয়ে কথার দরজাটি খুলে দিই, শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়ে অথবা অনুরাগে গলে গিয়ে প্রাণের কথা বলি, তখন একটু মন দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমাদের এই সমস্ত কথাগুলো আপনা আপনি একটি না একটি সুরে এসে বাঁধা পড়ছেই। কিছুটা সময় নিয়ে একাগ্রচিত্তে শুনতে পারলে সমস্ত সুরের ছাঁদগুলোও ধরে ফেলতে পারবেন—কারও কণ্ঠ কাব্যময়, নাটকীয়, বিপ্লবী, উদ্‌ভ্রান্ত, কারও বা সহজ শিশুর মত—ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

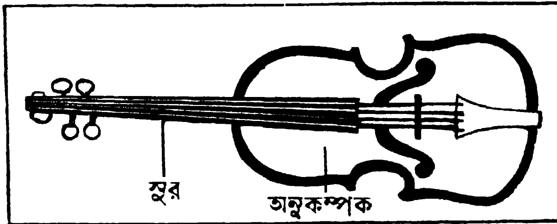
সুরসৃষ্টির উৎস



বাতাস ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যাবার সময় শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে এসে পৌঁছচ্ছে স্বরযন্ত্রের মধ্যে। স্বরযন্ত্রের মধ্যে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত স্বরগ্রন্থিগুলোতে ধাক্কা লেগে বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে সুরের উৎপত্তি ঘটে। ঝংকারের কাজ করে নাক, মুখ ও গলবিল।

মনুষ্যদেহে সুরসৃষ্টির এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের খুব মিল আছে।





	শরীরযন্ত্র	কাজ	বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য
বাতাস	ফুসফুস	সুরসৃষ্টির উৎস	১) বেহালাবাদক বা ড্রামবাদকের হাত-সঞ্চালনের পেছনে যে শক্তি ২) বাঁশীবাদকের শ্বসন-শক্তি
সুর	স্বরগ্রন্থি	ফুসফুস থেকে পাঠান হাওয়া যার গায়ে লেগে তরঙ্গ বা কম্পন তোলে।	১) বেহালার তার ২) ড্রামের খোলে লাগান চামড়া ৩) হারমোনিয়ামের রিড

	শরীরযন্ত্র	কাজ	বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য
স্বরভঙ্গি বা ঝংকার	অনুকম্পক (নাক, মুখ ও গলবিল)	ফুসফুস থেকে পাঠান বাতাস স্বরগ্রন্থিতে লেগে যে তরঙ্গ বা কম্পন তোলে সে-ই সুরকে ওঠা-নামা করায়, ঝংকার তোলে, শব্দ সুষমা ও ধ্বনি মাধুর্য বাড়াতে সাহায্য করে।	১) বেহালার তারের তলায় কাঠের শরীর। ২) বাতাস বেরোবার কাঠ ও পিতলের যন্ত্রগুলো যার মধ্যে হারমোনিয়ামের রিডগুলো বসান থাকে। ৩) বাঁশির মুখটুকু, যেখানে ফুঁ দেয়া হয়।

ঠোঁট, জিভ, দাঁত এবং নরম তালুর সংকোচন/সংঘর্ষণের ফলেও শব্দ-সুষমা ও ধ্বনি-মাধুর্যের সৃষ্টি হয়। নাক, মুখ ও গলবিল যখন সমানভাবে কাজ করবে তখনই কেবল সুরমাধুর্য সৃষ্টি সম্ভব। খুব বেশী মুখের ব্যবহার ও খুব কম গলবিলের ব্যবহার পাতলা ও বেনু বাঁশের মত সুর সৃষ্টি করে। খুব বেশী গলবিলের ব্যবহার ভারী, নিস্তেজ ও একঘেয়ে স্বরের জন্ম দেয়। খুব বেশী নাকের ব্যবহার অনুনাসিকতার আধিক্য ঘটায়। সম্পূর্ণ নাকের অনুপস্থিতি শব্দের লালিত্য এবং ঝংকার নষ্ট করে।

নীচের পদ্ধতিতে অনুশীলন করলে নাক, মুখ ও গলবিলের গর্তগুলো সম্প্রসারিত হবে ও পুরোদমে কাজ করতে পারবে।

মুখ এক ইঞ্চি ফাঁক করুন। আলগাভাবে দাঁতের উপর ঠোঁটগুলো যেন পড়ে থাকে এবং কোনক্রমেই যেন নড়াচড়া না করে। নীচের দাঁতের পাটিতে অগ্রভাগটিকে স্পর্শ করিয়ে মুখের ভিতর সমতলভাবে জিভটিকে শুইয়ে রাখুন। এবার 'আ' শব্দটীকে প্রক্ষেপণ করুন।



গলার স্কেল কিভাবে বার করবেন ?

হারমোনিয়ামে যতদূর সম্ভব নীচু পর্দায় স্বাভাবিকভাবে কণ্ঠকে নিয়ে যান। সেইখান থেকে একটি একটি পর্দা ধরে উপরে উঠতে থাকুন এবং সাধ্যমত যতদূর সম্ভব উঁচু পর্দায় গলা তুলুন। এইবার নীচের পর্দায় যে পর্যন্ত গলা গিয়েছিল সেখান থেকে উপর পর্দা পর্যন্ত রিডগুলো গুনুন এবং তাকে চার ভাগ করুন। নীচু পর্দা থেকে সেই চার ভাগের এক ভাগ যে পর্দাটি হচ্ছে সেটাই আপনার স্বাভাবিক পর্দা।

গায়ক ও অভিনেতা

গানে যে স্বরলিপি লিপিবদ্ধ থাকে তার চেয়েও মানুষের কণ্ঠস্বরে অনেক বেশী সুর ঘুমিয়ে আছে। গায়ক সুরকারের তৈরী করা নির্দিষ্ট স্বরলিপিই অনুসরণ করেন। অভিনেতা সংলাপ বলার জন্য কোন সুরের স্বরলিপি পান না। সংলাপের ভাব অনুযায়ী সুর সৃষ্টি করে নেন। গায়কের থেকে অভিনেতার স্বাধীনতা অনেক বেশী; বৈচিত্র্যময় সুরসৃষ্টিতে তিনি ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারেন।

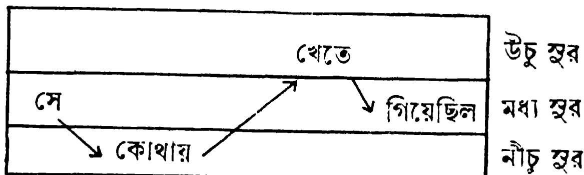
বাচিক অভিনয়ে সুরের ব্যবহার ঃ

গানের মত হঠাৎ এক সুর থেকে আরেক সুরে

এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত ও তীক্ষ্ণভাবে ভাব প্রকাশ সম্ভব।

উদাহরণ ঃ

সংলাপ ঃ 'সে কোথায় খেতে গিয়েছিল ?'

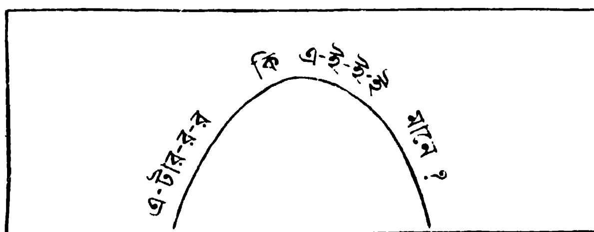


গানের মীড়ের মত ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে ও নেমে

সুরের এই বক্রগতি বিশেষ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে, সূক্ষ্ম চিন্তার ব্যঞ্জনাগুলো প্রকাশ করতে পারে। ভাষার এই সুর অতি প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত।

উদাহরণ ঃ

সংলাপ ঃ 'এটার কি এই মানে ?'



সুরের ঊর্ধ্বগতি

চিন্তার অপূর্ণতা, অস্বীকার, আতঙ্ক বা সন্ত্রাস, ভয়, স্নায়ুদৌর্বল্য, রাগ, ঘৃণা, আনন্দ, উল্লাস এবং প্রায়ই কোন প্রশ্ন করার সময় এই ক্রমউচ্চমান সুর ব্যবহৃত হয়। সংলাপের মধ্যে যদি কোন প্রশ্ন, দ্বিধা বা সন্দেহ থাকে অথবা সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না এরকম ভাব বোঝায়, তখন কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুরের এই ঊর্ধ্বগতি বিশেষ কার্যকরী।

উদাহরণ ঃ

— আর কত দূর (আমি জানতে চাই)

— হবে কি হবে না। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই

স্বরের নিম্নগতি

চিন্তার পূর্ণতা, আশ্বাস, দৃঢ়-বিশ্বাস ও শান্ত প্রকৃতির গভীরতম আবেগের স্তরকে প্রকাশ করে। এই সুর প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্তের দ্যোতক। কখনো কখনো কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় এই সুর ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ

আমি যেতে পারলে খুশি হতাম (সত্যি খুশি বলতে যা বোঝায়)

দ্বৈত স্বর

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, সূক্ষ্ম চিন্তা ও কৌতুকরস প্রকাশ করে। যে সংলাপের মধ্যে দু'টি ভাব একই সঙ্গে লুকিয়ে থাকে, সেখানেই এই দ্বৈত সুর বা ঢেউয়ের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদাহরণ ঃ

— আচ্ছা (আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বল না)

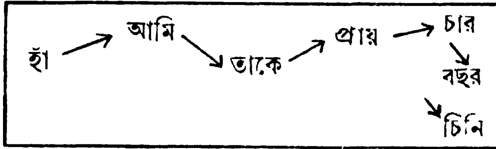
— কারণ ব্রুটাস একজন সম্মানিত ব্যক্তি
(বাইরে সম্মানিত কিন্তু ভিতরে বিশ্বাসঘাতক)

— হাঁ। আমি তাই ভাবি
(কিন্তু আমি একেবারেই নিশ্চিত নই)

মধ্যগতির সুর

অনেক সময় খুব উঁচুও না আবার খুব নীচুও না—মাঝামাঝি অবস্থায় সুরের খেলা চলে।

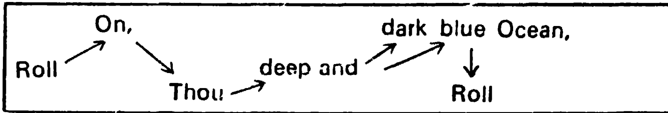
উদাহরণ :



সরু ও মোটা সুর

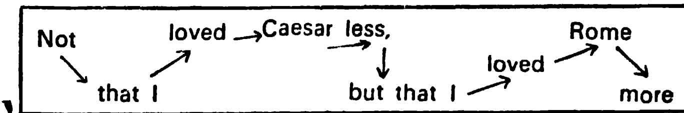
শ্রদ্ধা, বিষণ্ণতা, শারীরিক অক্ষমতা—এ সবই ছোট ছোট সিঁড়ি ও সরু সুরের সাহায্যে প্রকাশ পায়।

উদাহরণ :



আনন্দ, বিস্ময়, হঠাৎ রাগ এবং প্রেরণার সময় আমরা বড় বড় সিঁড়ি ও মোটা সুরকে ব্যবহার করি।

উদাহরণ :



উপরে যে সুরের ধাঁচগুলো দেয়া হ'ল, তা শুধু একটি রূপরেখা দেবার জন্যই। কখনোই ভাববেন না যে সুরের মাত্র এই কয়েকটিই বিভাজন আছে।

বাস্তবক্ষেত্রে অভিনয় করার সময় দেখবেন, আরো কত অসংখ্য সুরের মায়াজাল তৈরী করে চলেছেন, সংলাপ বা শব্দ প্রক্ষেপণে কত বৈচিত্র্যময় সুরের আবিষ্কার করে ফেলেছেন। যেমন—

সুরের বৈচিত্র্য	উদাহরণ	সম্ভাব্য ভাবপ্রকাশ
অল্প নিম্নগতি	হ্যাঁ	স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থশূন্য হাঁ-সূচক, কিন্তু খুব কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে না। বরং সম্ভবতঃ কঠোর, হিংস্র অথবা ভয়ানক ভাবের প্রকাশ ঘটছে।
বেশী নিম্নগতি	হ্যাঁ	বেশী জোরালো, প্রবল কৌতূহলপূর্ণ বা আগ্রহী।
অল্প ঊর্ধ্বগতি	হ্যাঁ	টেলিফোনে উত্তর দেবার সময় বা নিজের নাম 'অমুক না ?' বলে কেউ জানতে চাইলে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবার সময় অথবা কারও কথাতে সায় দেবার জন্যও এই সুর ব্যবহার করা চলে।
বেশী ঊর্ধ্বগতি	হ্যাঁ	বিস্মিত অথবা উদ্দীপিত।
অল্প-নিম্ন ঊর্ধ্বগতি	হ্যাঁ	সামান্য সন্দেহের প্রকাশ অথবা কোন কিছুকে চালিয়ে যাওয়া বা বলে যাওয়ার জন্য আহ্বান বা সম্মতি।

সুরের বৈচিত্র্য	উদাহরণ	সম্ভব্য ভাবপ্রকাশ
বেশী-নিম্ন ঊর্ধ্বগতি	হ্যাঁ	কোন অর্থপ্রকাশে দৃঢ় ও স্পষ্ট হাঁ-সূচক অভিব্যক্তি। যেমন 'আমি তোমাকে অন্ততঃ ৫০ বার এই কথাটি বলেছিলাম।'
ঊর্ধ্ব নিম্নগতি	হ্যাঁ	উদাহরণ ঃ 'নিশ্চয়ই হতে পারে' অথবা 'আমারও চিন্তা করা উচিত'
লেভেল	হ্যাঁ	একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি

কণ্ঠস্বর নমনীয় করার ব্যায়াম

নীচের ব্যায়ামদুটো করলে গলার মাংসপেশীতে কোনরকম জোর না দিয়েই উঁচু ও নীচু সুরে ইচ্ছেমত সংলাপকে ওঠাতে ও নামাতে পারবেন, সুখশ্রাব্য সুরের প্রয়োজনে কণ্ঠের তন্ত্রীগুলো সজীব ও সক্রিয় থাকবে।

১) মাথাটি বুকের কাছে নামিয়ে আনুন। চোয়ালটিকে শিথিল করে মাথাটিকে আস্তে আস্তে পেছনের দিকে যতদূর সম্ভব নিয়ে যান। আবার মাথাটি বুকের কাছে নামিয়ে আনুন ও ধীরগতিতে ডান কাঁধ, পিঠ ও বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে বৃত্তের মত ঘুরিয়ে আনুন। এবার রিল্যাকস্ করুন।

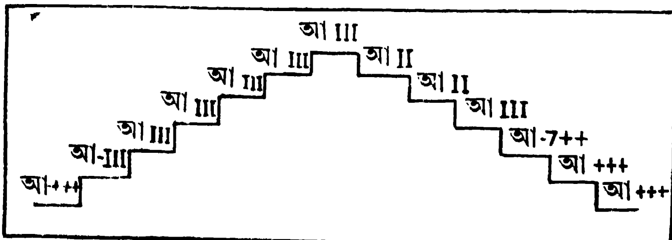
ঘুম থেকে জেগে উঠে পশুরা যেমনভাবে তাদের শরীরটাকে ছড়িয়ে দেয়, আড়মোড়া ভাঙ্গে, তেমনিভাবে সমস্ত শরীরটি ছড়িয়ে দিন। পা, পিঠ ও হাতের বড় বড় মাংসপেশীগুলো আল্‌গা করে দিতে থাকুন। এবার কল্পনা করুন, আপনার মাথার উপর ঝিরঝির করে উষ্ণ জল পড়ছে। কপাল বেয়ে জলের ধারা নামছে—ভুরু, চোখের পাতা, গাল—সব ধুয়ে দিচ্ছে। আপনার নাক, চোখ, ঠোঁট, চোয়ালের নীচের অংশ, মুখের চারপাশের ছোট

ছোট মাংসপেশীগুলো শিথিল ও হাল্কা করে দিচ্ছে। এবার মাথাটিকে সামনের ও পেছনের দিকে গোল করে ধীরে ধীরে ঘোরান, যতক্ষণ না গলার ভেতরের ও বাইরের মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়। এরপর ভাবুন জলের ধারাটি আপনার সমস্ত শরীর ধুয়ে দিচ্ছে—আপনার হাত ও হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলো, বুক, হৃদপিণ্ড, পেট, এমনকি পায়ের পাতা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে আপনার হাই ওঠা উচিত, আর হাই তুলবেনও কারণ, হাই তোলার মত কণ্ঠস্বরের ভাল ব্যায়াম আর নেই।

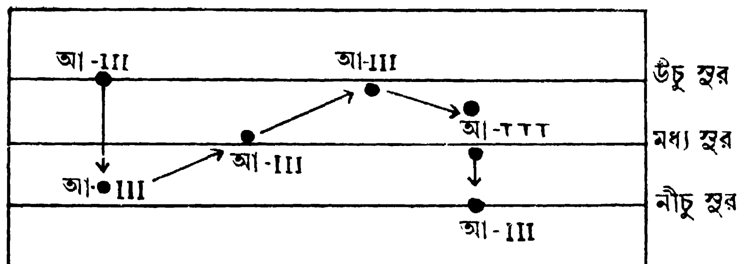
২) আবার মাথাটি বুকের কাছে নামিয়ে আনুন। চোয়াল শিথিল অবস্থায় রেখে ও তার মাংসপেশীগুলো ব্যবহার না করে আলতোভাবে হাতদুটো গালের উপর রাখুন ও হাত দিয়ে মাথাটি তুলে ধরুন। যখন মাথাটি তোলা হয়ে যাবে, চোয়াল ঝুলিয়ে রাখুন। মুখে যতদূর সম্ভব কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে না। শূন্য চোখে মাংসপেশীগুলোকে নরম করতে সাহায্য করুন।

অনুশীলনী :

১। নিচের ছবিটির মত 'আ' শব্দটি দিয়ে গলার একেবারে নীচু পর্দা থেকে শুরু করে সবচেয়ে উঁচু পর্দায় ধীরে ধীরে স্বর তুলুন। এরপর উঁচু পর্দা থেকে নীচু পর্দায় ঠিক ঐরকমভাবে স্বরকে নামিয়ে আনুন। প্রতি পর্দা শুরু করার আগে বেশী করে দম নিয়ে নেবেন। মাঝপথে যেন দম ফুরিয়ে না যায়। অন্য স্বর যেন এসে না পড়ে। দু'রকম স্বর যেন না হয়। গলা যেন ভেঙ্গে না যায়। এটি অনেকটা গানের সা-রে-গা-মা সাধার মত হবে।



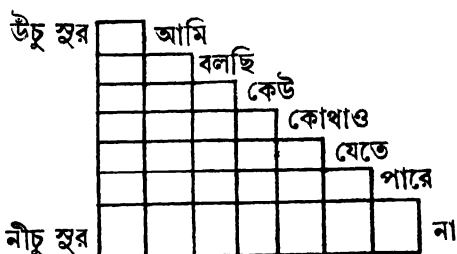
২। এবার নীচু সুর থেকে হঠাৎ উঁচু সুরে বা উঁচু সুর থেকে হঠাৎ নীচু সুরে অথবা নীচু সুর থেকে মাঝের পর্দায় বা উঁচু থেকে মাঝের পর্দায়—এমনি করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ 'আ' শব্দটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।



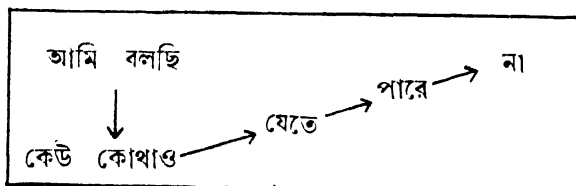
৩। নীচের সংলাপটি সর্বোচ্চ সুরে বলা শুরু করে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে সর্বনিম্ন সুরে নিয়ে আসুন ঃ

সংলাপ ঃ 'আমি বলছি কেউ কোথাও যেতে পারে না'

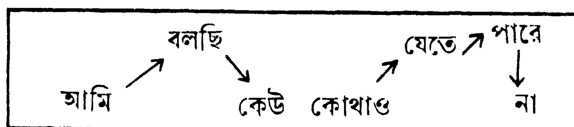
[আলো নেই—প্রণব মিত্র]



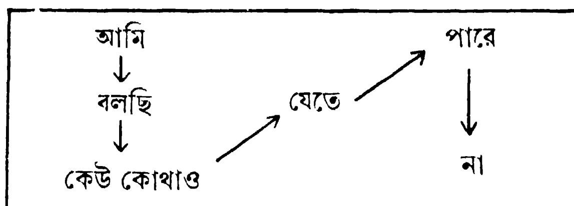
এই লাইনটি আবার সুর পরিবর্তন করে অন্যভাবে বলুন ঃ



অথবা এই সুরে ঃ



আবার



প্রথম প্রথম হয়ত সুরের উত্থান-পতনের এরকম অভ্যাস যান্ত্রিক ও কৃত্রিম শোনাবে. কিন্তু এই পদ্ধতিতেই বিচিত্র সুরের প্রয়োগ শিখতে পারবেন।

৪। ধরুন আপনি কাল্পনিক ফোনে কারো সাথে কথা বলছেন। শুধুমাত্র 'ও' শব্দটি দিয়ে বিভিন্ন সুরের সাহায্যে নীচের ভাবগুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। সুরের মধ্যে এমন বৈচিত্র্য থাকা চাই যাতে উপস্থিত সবাই ফোনের ওপার থেকে কি বলা হচ্ছে ও আপনার প্রতিক্রিয়া কি ঘটছে তা বুঝতে পারেন।

—হ্যালো—

—'—'

—ওঃ (আনন্দ)

—'—'

—ওঃ (তাই বুঝি)

—'—'

—ওঃ (অদম্য কৌতূহল)

—'—'

—ওঃ (ভয়)

—'—'

—ওঃ (হতবুদ্ধি বা বিহ্বলতা)

—'—'

—ওঃ (আতঙ্ক)

—'—'

—ওঃ (অমনোযোগ)

—'—'

—ওঃ (তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ)

—'—'

—ওঃ (অল্প বিস্ময়), ওঃ (বিরাট বিস্ময়)

—'—'

—ওঃ (কি সাংঘাতিক)

—'—'

—ওঃ (আমি এখন বুঝতে পারছি)

—'—'

—ওঃ (নিদারুণ বিরক্তি)

—'—'

—ওঃ (হঠাৎ যন্ত্রণা)

—'—'

—ওঃ (কৌতূহলশূন্যতা বা উদাসীনতা)

—ওঃ (হতাশা)
—'—'
—ওঃ (নিদারুণ শ্রান্তি)
—'—'
—ওঃ (সমবেদনা)

৫। না নাঁ না বা ও তাই বুঝি? ও তাই বুঝি? ও তাই বুঝি?

৬। 'হ্যাঁ' শব্দটিকে শুধুমাত্র সুরের পরিবর্তন করে কুড়ি রকম অর্থ প্রকাশ করুন, যেমন—

—হ্যাঁ (নিশ্চয়ই)
—হ্যাঁ (হতেও পারে)
—হ্যাঁ (আমারও সন্দেহ আছে)
—হ্যাঁ (বিরক্তি)
—হ্যাঁ (বিস্ময়)
—হ্যাঁ (তুমি কি এ ব্যাপারে সিরিয়াস)
—হ্যাঁ (আমি এটা পছন্দ করি না)
—হ্যাঁ (না)
—ইত্যাদি

৭। নীচু সুরে শুরু করে (গলায় জোর না দিয়ে) আস্তে আস্তে ক্রমশঃ উঁচু সুরে ১ থেকে ২-৩-৪-৫ এমনি করে দশ পর্যন্ত বলতে থাকুন। বলা শেষ হলে উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ উঁচু সুরে ১০ থেকে শুরু করে ৯-৮-৭-৬ এমনি করে ১ পর্যন্ত নীচু সুরে নামতে নামতে আসুন।

৮। পর্দার পেছনে দাঁড়ান। নীচের সংলাপগুলো বলুন। কাউকে পরীক্ষা করতে বলুন যে আপনার গলায় সুরের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা ঃ

ক) 'হাসো, সমস্ত পৃথিবী তোমার সঙ্গে হাসবে। কাঁদো, তোমাকে একা কাঁদতে হবে।'

খ) 'একটিই প্রশ্ন—হবে কি হবে না।'

গ) 'আমাকে স্বাধীনতা দাও অথবা মারো।'

ঘ) 'আমি কি বলেছি তুমি শুনেছ ? তাহলে যাও।'

ঙ) 'দেখ, প্লেনটা ভেঙ্গে পড়ছে।'

চ) 'আমি কখ্খনো, কখ্খনো, কখ্খনো তোমাকে বিশ্বাস করবো না।'

ছ) 'না, কখনই না—আচ্ছা চলতে পারে।'

৯। ক) 'কানাই দীপককে পাঁচ টাকা দিয়েছিল' (১০ রকম ব্যাখ্যা দিন)

খ) 'তুমি আজ রাতে আমার সাথে বাড়ি আসছ' (১৪ রকম ব্যাখ্যা দিন)

গ) 'সামনের মাসে সাধারণ নির্বাচন' (১২ রকম ব্যাখ্যা দিন)

১০। ঘরে বসে আছেন। কল্পনা করুন দরজায় কেউ ডাকল। সে যাকে খুঁজছে সেই লোকটি ঘরে নেই। সে অনেক বিস্ময়কর খবর নিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র 'না' শব্দটি ব্যবহার করে সে কি কি বলল উপস্থিত সবাইকে বুঝিয়ে দিন।

১১। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আজ বাড়ি যাচ্ছ'—এই সংলাপটির সাহায্যে নীচের অর্থগুলো প্রকাশ করুন ঃ

ক) আমি সত্যি ভেবেছিলাম তুমি যাচ্ছ।

খ) আমি নিশ্চিত ছিলাম না।

গ) তোমার বন্ধু সেখানে অপেক্ষা করছে।

ঘ) আমি ভেবেছিলাম যাওয়াটা ঠিক হয়েছিল।

ঙ) তোমার অফিসে নয়।

চ) কাল নয়।

১২। নীচের সংলাপটি প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন ভাবে বলতে পারে ঠিক তেমনভাবে বলার চেষ্টা করুন। চরিত্র অনুযায়ী সুরের পরিবর্তন করবেন ঃ

ক) 'এবার তোমার পালা' (কুচক্রী অপরাধী)

খ) 'থাম ! তাড়াহুড়ো করে কিছু করার আগে আরো চিন্তা করো' (খিটখিটে বুড়ো)

গ) 'ওঃ কি সুন্দর সকাল' (নামকরা অভিনেতা, যে অনেকদিন সকাল হতে দেখেনি)

১৩। One থেকে Ten পর্যন্ত Vowel-গুলো (o,e ইত্যাদি) উচ্চারণের সময় বড় করে স্বর নামিয়ে বলুন, যেমন ঃ

(ক) One (চ) Six
(খ) Two (ছ) Seven
(গ) Three (জ) Eight
(ঘ) Four (ঝ) Nine
(ঙ) Five (ঞ) Ten

এবার উল্টো করে Vowel-গুলো উঁচু স্বরে বড় করে বলুন। যেমন

(ক) One (চ) Six
(খ) Two (ছ) Seven
(গ) Three (জ) Eight
(ঘ) Four (ঝ) Nine
(ঙ) Five (ঞ) Ten

১৪। 'তোমার বাবা কি কাল আমাদের সঙ্গে আসতে পারবেন'—এই সংলাপটি বিভিন্ন সুর ব্যবহার করে এমনভাবে বলুন যাতে নীচের অর্থগুলো প্রকাশ পায় ঃ

ক) তিনি কি সমর্থ ?

খ) আমার বাবা আসছেন, তোমার বাবা পারবেন তো ?

গ) তিনি কি বেরোতে পারবেন ?

ঘ) আজকের পরিবর্তে।

১৫। 'ইঞ্জিন ড্রাইভাররা কি হাওড়া ষ্টেশনে ধর্মঘট করবে'—এই সংলাপটি শুধুমাত্র সুরের পরিবর্তন করে নীচের অর্থগুলো প্রকাশ করুন ঃ

ক) তুমি কি জান এটি সত্য ?

খ) বাস ড্রাইভাররা নয়।

গ) কুলিরা নয়।

ঘ) ওরা কি ঠিকই করে ফেলেছে যে ধর্মঘট করবে ?

ঙ) ওরা কি এরকম চূড়ান্ত কিছু করতে পারে ?

চ) শিয়ালদায় যেরকম ধর্মঘট হয়েছিল সেরকম কি ?

ছ) ষ্টেশনে কি কোন সভা হবে ?

১৬। নীচের প্রথম সংলাপটি সবচেয়ে নীচু সুরে বলবেন। পরের সংলাপগুলো বলার সময় একটু একটু করে উঁচু সুরে বলার অভ্যাস করুন ঃ

ক) 'উঃ কি অন্ধকার' (সবচেয়ে নীচু সুরে)

খ) 'এই অন্ধকারে হাঁটতে গেলে বেড়ালের চোখ চাই' (একটু উঁচু সুরে)

গ) 'আমার মাঝে মাঝে বেশ ভয় করে' (আর একটু উঁচু সুরে)

ঘ) 'হ্যাঁ, বেশ ভয় করে' (আরেক ধাপ উঁচু সুরে)

ঙ) 'আমার চাকরিটাই এইরকম' (আরেক ধাপ উঁচু সুরে)

চ) 'আমায় সবাই বারণ করেছিল' (আরো উঁচুতে)

ছ) 'আমি শুনিনি' (আরো উঁচু সুরে)

জ) 'কে ? কে ওখানে ?' (সবচেয়ে উঁচু সুরে)

১৭। গলার ভেতর থেকে নানারকম শব্দ বার করার চেষ্টা করুন। সরু, মাঝারি, ভারী, কম্পিত, দীর্ঘায়িত এবং ছন্দোবদ্ধ শব্দ অভ্যাস করে আয়ত্ত করুন। এরজন্য দরকার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও দীর্ঘদিনের পরিশ্রম। সূত্র ধরে দিতে বললে বলা যায় ঃ

ক) আশপাশের পরিচিত মানুষদের কণ্ঠস্বর ভাল করে মন দিয়ে শুনুন ও নকল করুন।

খ) আশপাশের সমস্ত শব্দানুসঙ্গকে গলায় তুলে নিন। যেমন, ঝড়ের আওয়াজ, প্লেন উঠা-নামা, রেলগাড়ি চলার শব্দ ইত্যাদি।

গ) পশু-পাখির ডাকের নকল করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

ঘ) বিভিন্ন বয়সের (৫ থেকে ৮০ পর্যন্ত) মানুষের কণ্ঠস্বরের তারতম্য লক্ষ্য করুন ও হুবহু নকল করার চেষ্টা করুন।

ঙ) ভিন্নভাষী মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করুন। রেডিও-র বিভিন্ন সেণ্টার খুলে অপরিচিত ভাষার গান ও কথা শুনুন, অনেকরকম সুর শুনতে পারবেন।

চ) শ্রেণী বিভাগে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করুন ও সেইমত নকল করুন—যেমন, চাষীর কণ্ঠস্বরের কর্কশতা, শ্রমিকের ভগ্নতা, যত্নে ও বৈভবে লালিত উচ্চমধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর কণ্ঠের সুমিষ্টতা ইত্যাদি।

মুখস্থ

মুখস্থ

সংলাপ ভুল বলা এবং তারপর একটি শব্দ মনে করার জন্য আরেকটি শব্দ পুনরাবৃত্তি করা, অর্থ না বুঝে যন্ত্রবৎ মুখস্ত বলার উদাহরণ। স্বাভাবিকতা নষ্ট করে যন্ত্রবৎ মুখস্ত করা অনেক অপটুত্বের লক্ষণ।

— ভায়োলা স্পোলিন

মনস্তত্ত্ব ফলিত বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করার পর বহু মনস্তাত্ত্বিকেরা মুখস্থ করার ব্যাপারে একটি নিশ্চিত সূত্র নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন।

মঞ্চের ক্রিয়াটি কি হবে না জেনে যদি অভিনেতা তোতাপাখীর মত সংলাপ মুখস্থ করেন, তবে তিনি একটির সঙ্গে আরেকটির সমন্বয় সাধন করতে অসুবিধা বোধ করতে পারেন এবং তাতে ফলটি ভাল হয় না।

— ভ্যান এইচ কার্টমেল।

চিন্তার অনুবর্তিতা শব্দের অনুবর্তিতাকে শেখাতে সাহায্য করে।

— ডঃ ফ্র্যাঙ্ক মিলার

অনেক জায়গায় দেখেছি অনেক শিল্পী তার সংলাপ কণ্ঠস্থ করে এনেছে, কিন্তু চরিত্রের কোন্ সংলাপ কেমন করে বলতে হবে, কোথায় জোরে হবে, কোথায় আস্তে হবে, এসব চিন্তা না করে পদ্য পড়ার মত বলে যেতে থাকে। এটা কিন্তু ঠিক নয়।

— জি. সি. ভট্টাচার্য

একজন নির্দেশক যাকে আমি জানি, তিনি বলেন, সংলাপ মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই। নাটকের চরিত্র ও ঘটনাস্রোতের উপর একাগ্র মনোসংযোগের দ্বারা সংলাপকে তোমার কাছে আসতে দাও। যদি তুমি সময় পাও, যদি তোমার মনের সেই রকম একাগ্রতা থাকে এবং যদি নাট্যকার নাটকটি সেইভাবে লিখে থাকেন তাহলেই দেখবে, উপদেশটা অবশ্যই তোমার পক্ষে খুবই সুন্দর এবং কার্যকর হয়ে উঠবে।

— প্রবোধবন্ধু অধিকারী

আমাদের পরিচালক কখনই চান না আমরা পার্ট পেয়েই আগে মুখস্থ করি। এমনকি প্রথমেই 'অভিনয়' করতেও বারণ করেন। আমরা আমাদের পার্ট পাবার পর পরিচালকের সামনে অভিনয় না করে শুধুমাত্র পঠন-পাঠন চালাতে থাকি। যে কদিন এভাবে চলে, পরিচালক কোথায় থামতে হবে, কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় কিভাবে নিঃশ্বাস নিতে হবে এবং মাঝে মাঝে অভিনীতব্য চরিত্রটির কাঠামোটি এবং কখনও কখনও চরিত্রটির বিশেষ জায়গাগুলো অভিনয় করে বুঝিয়ে দেন। এরপর চলে মডেল সেট নিয়ে মহলা বা Table Top যখন choriography-র জন্য পরিচালকের হাতে থাকে কিছু দাবার ঘুঁটি। আমরা সবাই তখনও একইভাবে বসে বসে আরও ডিটেলে আমাদের অভিনেয় চরিত্রের গভীর রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। তারপর আসে দাঁড়িয়ে মহলা দেবার পালা। হাতে হাতে নিজেদের পার্ট। তখনও আগে ভাবা কিছু ভাবনা পরিচালকের নেহাতই বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে এবং অভিনেতার কাছে শ্রমসাধ্য ও তাৎক্ষনিক ভাবনায় অলংকৃত কিছু শৈল্পিক ছোঁয়া লাগিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীটি আরও সুচারুরূপে প্রকাশ করতে প্রয়াস পান। এত কিছুর পরও পার্ট হয়ত আমাদের হাতেই আছে। সাজ-মহলায় Run Through-র ফাঁকে ফাঁকে কখন যে লেখা পার্ট হাত থেকে খসে যায় আমরা বোধ করি তা নিজেরাও টের পাই না।

— ভারতীয় নাট্যশালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক উৎপল দত্ত এ প্রসঙ্গে যে অনুকরণীয় রীতি অনুসরণ করেন, তাঁর নাট্যগোষ্ঠীর জনৈক সদস্যের মুখ-নিঃসৃত উদ্ধৃতি এটি।

মঞ্চ মায়া ও সংলাপ প্রয়োগ

নাট্যশিল্পের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো দর্শকরা জেনেশুনেই আসে যে নাট্যকারের লেখা সংলাপ আপনি মুখস্থ করেই মঞ্চে আসেন ও সহ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সংলাপ কিংবা জিজ্ঞাসা ও উত্তর আগেই জানা। আপনারা কখনই নিজেদের কথা বলবেন না, নাট্যকারবর্ণিত চরিত্রের সংলাপ শোনাবেন মাত্র। তবুও নাটক দেখার ২ বা ৩ ঘণ্টা সময়টুকু তাঁরা এই সত্যটি ভুলে যান (নাকি ভুলে যেতে চান) ও আপনার উচ্চারিত সংলাপগুলোই এই মুহূর্তে প্রথম শুনলেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন, মেনে নেন—যেমন, এ্যামবারের আলোকে মনে করেন সকাল হলো, ঝড়ের শব্দে মনে হয় সত্যিই ঝড় বইছে, জলভর্তি কাপে চুমুক দিলে মনে করেন চা খাচ্ছেন বা ওথেলো ডেসডিমোনাকে মারলে মনে করেন ডেসডিমোনা সত্যি সত্যি মরে গেছেন। আসলে এ সবই তো অভিনয়—এ সবইতো ভান -এত ভালো অভিনয়, এত নিখুঁত ভান আপনি করেন যাতে দর্শকের কাছে সেই মুহূর্তগুলো জীবন্ত মনে হয়, খুব স্বাভাবিক মনে হয়। তাই তো ডেসডিমোনা মরে গেলে দর্শক কাঁদেন, চাণক্য-আত্রেয়ীর দৃশ্যে তাঁদের বুকটি হাহাকার করে ওঠে, হ্যামলেটের মুখে To be or not to be that is the question শুনে নিজেকেই প্রশ্ন করে বসেন। এই যে মঞ্চ মায়া বা ইলিউসন—এটিই নাট্যশিল্পের চমৎকারিত্ব। এই যে সব মিথ্যা হয়েও সমস্ত সত্যি, সবটুকু রিহার্সাল দিয়ে তৈরী করা অভিনয় হয়েও স্বাভাবিক, বিশ্বাস্য—এটিই নাট্যশিল্পের প্রাণ। তাই শুধু ভাসা-ভাসা বা অর্ধেকটি মুখস্থ করলেই চলবেনা—এমনভাবে মুখস্থ করতে হবে যাতে মনেই না হয় মুখস্থ বলছেন।

পার্ট মুখস্থ না করে প্রম্পটারের উপর নির্ভর করে মঞ্চে নামাটি বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন চড়া আলোতে একগাদা লোকের চোখের সামনে দাঁড়ালে প্রম্পটার "আমি তোমাকে ভালোবাসি" কথাটি হাজার বার গলা ফাটিয়ে বললেও একটি শব্দও তখন কানে ঢোকেনা—খালি হাজার হাজার সরষে ফুল দেখেন।

একটি সর্বনাশা পদ্ধতি

বহু অভিনেতা মহলার গোড়াতেই তাঁদের পার্টটির কমা-ফুলস্টপ পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলেন। এটি একটি সর্বনাশা পদ্ধতি। সংলাপগুলো নিশ্চয়ই

দরকার। কিন্তু সেগুলোই অভিনয়ের প্রথম ও শেষ কথা নয়। একথা ঠিক যে, যত তাড়াতাড়ি পার্ট মুখস্থ করবেন তত তাড়াতাড়ি সংলাপকে ঘসে মেজে মসৃণ ও উজ্জ্বল করতে এবং সূক্ষ্ম কাজগুলো করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পরিষ্কার না হয়ে ও সংলাপের অন্তর্নিহিত অর্থটি বোঝার আগেই যদি মুখস্থ করে ফেলেন তবে মঞ্চে কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হবেন না। শুধু সংলাপ মুখস্থ করলেই চলবে না, অপর চরিত্ররা কে কি আচার-আচরণ করবেন, কোথায় কতখানি থামবেন তাও যেমন মনে রাখতে হবে, ঠিক তেমনি মনে রাখতে হবে মঞ্চের উপর অন্যান্য শিল্পের কোথায় কতখানি ভূমিকা রয়েছে ; আপনার অভিনয়ের সঙ্গে সেই ভূমিকা কোন্‌খানে কতটুকু যোগসূত্র স্থাপন করছে। অন্যথায় যদি আপনি তড়িঘড়ি রিহার্সালের অনেক আগে থেকেই পার্ট মুখস্থ করে ফেলেন, মুখস্থ করা সংলাপগুলো নিষ্প্রাণ শোনাবে, মনে হবে কলের পুতুল কথা বলছে।

আরো কতকগুলো ভাববার ব্যাপার আছে। বেশ কয়েকটি রিহার্সাল হয়ে যাবার পর সংলাপের মধ্যে কোন একটি শব্দের উপর জোর না দিয়ে অন্য একটি শব্দের উপর হয়তো জোর দিতে চাইলেন বা বিরতি ও স্বরক্ষেপণের ভোল্যুটি পাল্টে ফেলতে চাইলেন, নতুন কোন সুর আনতে চাইলেন, স্বরগ্রামের ওঠা নামার পরিবর্তন করতে ইচ্ছা হল অথবা যেটি নিশ্চিতভাবে ঘটবেই, পরিচালক কিছু সংলাপ একেবারেই বাদ দিয়ে দিলেন, পরিবর্তে সংলাপ সংযোজন করলেন বা একটি পুরো দৃশ্যকে বদলে সেই জায়গায় নতুন দৃশ্য ঢোকালেন। যদি সংলাপ আগেই মুখস্থ করে ফেলেন তবে মাথার মধ্যে যে শব্দ-পদ্ধতি ঢুকিয়ে ফেলেছেন, তা' মুছে ফেলতে বা ভুলে যেতে খুবই কষ্ট হবে কারণ, প্রথমতঃ মুখস্থ করা সংলাপ একেবারে ভুলে যেতে হবে ও নতুন করে নতুন সংলাপ মুখস্থ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ গোড়াতে সংলাপ মুখস্থ করার সময় যে আবেগ ও অনুভূতি অনেক পরিশ্রমে ও অধ্যাবসায়ে মনে ও দেহে সঞ্চারিত হয়েছিল তার সমস্তটুকু জোর করে (অধিগত জ্ঞান ইচ্ছাকৃতভাবে ভোলা সহজ কাজ নয়) ভুলে যেতে হবে।

একজন ভালো অভিনেতা হয়তো একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে রিহার্সাল শুরু করতে পারেন ; কিন্তু বিরতি, ছন্দ, সুর এবং সংলাপের সাথে চলাফেরা ও অঙ্গভঙ্গির সম্পর্কটি যখন ধরে ফেলেন বা রপ্ত হয়ে যায়, তখন এই মুখস্থ বলাটিকেই মনে হয় স্বাভাবিক—খুব স্বাভাবিক।

কখন পার্ট মুখস্থ করবেন

যতক্ষণ না নাটক রিহার্সালে প্রাণ পাচ্ছে ; অন্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা কিভাবে অভিনয় করছেন, কোথায়, কোন্ সময়, কেমন করে মঞ্চে চলাফেরা করতে হবে, অন্য চরিত্রের সঙ্গে কথা বলার সময় মঞ্চে আপনার অবস্থান কি রকম হচ্ছে এবং মঞ্চসজ্জার একটি মোটামুটি ছবি পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পার্ট মুখস্থ না করাই উচিত। এতে সুবিধা হবে এই যে, যখন পরবর্তী পর্যায়ে মন দিয়ে পার্ট মুখস্থ করবেন তখন বই বা পাণ্ডুলিপির ছাপানো বা হাতে লেখা পাতাগুলোর ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠবে না ; মনের মধ্যে সম্ভবতঃ দরজা, জানালা, মাটি, দাওয়া ও খড়ের চাল সমেত একটি ঘর, up stage-এ কঞ্চির বেড়া দেওয়া রাস্তা, LC-তে রাখা তুলসীতলা—আঙ্গিনায় চরিত্রদের হাঁটা, চলা, খোঁজা—সমস্ত ছবিটিই ভেসে উঠবে। ইতিমধ্যে যে চরিত্রটি রূপ দিতে চেষ্টা করছেন তার সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যাবে। বিশেষতঃ অন্যান্য চরিত্রদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কতটুকু তাও নিরূপণ হয়ে যাবে। যান্ত্রিকভাবে কখনই পার্ট মুখস্থ করবেন না। নাটকের সাথে এদের কি সম্পর্ক, সংলাপগুলো কেন বলা হচ্ছে, কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, এটি কোন প্রশ্ন কিনা, কোন উত্তর কিনা, কোন্ মানসিক আবেগের ফল—মহলা চলাকালীন এ সবই বুঝে এবং মাথায় রেখে মুখস্থ করবেন। রিহার্সাল চলাকালীন সংলাপের সমস্ত রকম পরিবর্তন বা পরিমার্জনের পর এবং বিজনেস, চলাফেরা, অঙ্গসঞ্চালন যান্ত্রিকভাবে রপ্ত হয়ে যাবার পরই মুখস্থ করাটি সহজসাধ্য কাজ। এ্যাক্‌শন্ ও চলাফেরার সাথে সাথে পার্ট মুখস্থ করাটিই সোজা পদ্ধতি। কারণ সংলাপ এ্যাক্‌শন্‌কে এবং এ্যাক্‌শন্ সংলাপকে মনে করতে সাহায্য করে। হয়ত প্রথমে এই দুটো জিনিসকে একসঙ্গে করাটি শক্ত হতে পারে কিন্তু, যেহেতু সংলাপের সঙ্গে সমতা রেখেই 'মুভমেন্ট' ও অঙ্গভঙ্গির কাঠামোটি তৈরী হয়, তাদের মিলন ও সংযোগ শেষ পর্যন্ত অভিনেতার স্মৃতিতে মিশে যায়।

কি ভাবে মুখস্থ করবেন

সংলাপকে শুধু কণ্ঠস্থ করলেই চলবে না—আত্মস্থ করতে হবে। তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে যখন রিহার্সাল চলছে তখন সংলাপগুলো ঢুকে যাবে মজ্জার মধ্যে,

দেহ-মনে, শয়নে-স্বপনে। শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো খুব সহজ, প্রায় ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে মুখস্থ হওয়া চাই। সংলাপগুলো কোন অবস্থাতেই আটকে যাবেনা, থেমে থাকবে না, 'কি বলব' প্রশ্নটির অবকাশ থাকবে না। অবিচ্ছিন্ন ঝরণাধারার মতো মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে।

১। **আত্মস্থ পদ্ধতি :**

ক) সময়কে পেছনে ফেলে

আপনার সামনে সেকেণ্ডের কাঁটা আছে এমন একটি ঘড়ি রাখুন। এবার আপনার পার্টের একটি বড়ো সংলাপ বেছে নিন ও মুখস্থ বলুন। বলা শেষ হলে সময় দেখুন। ধরুন, সংলাপটি বলতে আপনার সময় লাগলো তিন মিনিট। এবার একটু তাড়াতাড়ি সংলাপটি বলে আড়াই মিনিটে শেষ করার চেষ্টা করুন। পারলে, আরও তাড়াতাড়ি সংলাপটি বলে আরো কম সময়ে অর্থাৎ দু'মিনিট, তারপর দেড় মিনিট, তারপর এক মিনিটে বলার অভ্যাস করুন। এভাবে যত কম সময়ে বলতে পারবেন ততই পার্ট আত্মস্থ হয়ে যাবে। শেষ পর্যায়ে খুব দ্রুত বলার সময় হয়তো সমস্ত শব্দেরই স্পষ্ট উচ্চারণ হবে না, কমা, দাঁড়ি ইত্যাদি মুছে যাবে। তা হোক, ক্ষতি নেই।

উদাহরণ :

সংলাপ	মুখস্থ বলার সময় কমাতে হবে	ফল
সরকার, তোর ডাইরীতে লিখে রাখ্ ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ার বিজনেস ম্যাগ্‌নেট, এই মাণিক সর্বাধিকারী উড়িষ্যার এক গভীর জঙ্গলে আজকের তারিখে ১৫ মিনিট ধরে পেচ্ছাব করেছিলো—পেচ্ছাব আর ১৫ মিনিট—Underline (শিকার—অনুজন্ দাশগুপ্ত)	প্রথমবার (২০ সেকেণ্ড)	মোটামুটি মুখস্থ তবে আটকাচ্ছে
	দ্বিতীয়বার (১৫ সেকেণ্ড)	পুরো মুখস্থ দু'এক জায়গায় গোত্তা খাচ্ছে
	তৃতীয়বার (১২ সেকেণ্ড)	কণ্ঠস্থ, কোথাও আটকাচ্ছে না, তবে সচেতনভাবে বলতে হচ্ছে
	চতুর্থবার (১০ সেকেণ্ড)	যান্ত্রিক, কিছুটা সচেতন, কিছুটা অবচেতন
	শেষবার (৫ সেকেণ্ড)	আত্মস্থ, সম্পূর্ণ অবচেতন

সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথেও নাটকের সম্পূর্ণ একটি দৃশ্য বা সব দৃশ্যগুলোই এইভাবে ঘড়ি ধরে অভ্যাস করতে পারেন। সবাই মিলে একসাথে বললে মজা পাবেন, আনন্দ পাবেন আর পরস্পরের প্রতি নিজের অজান্তেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, কার কতটুকু মুখস্থ হয়েছে তাও ধরতে পারবেন, কেউ 'কিউ' মিস করবেন না—পার্টও কোনদিন ভুলবেন না। বহুদিন, এমনকি বহু বছরেও ঐ নাটকটির জন্য আর রিহার্সালেও প্রম্পটিং-এর দরকার হবেনা, অনেকদিন পর শো পড়লেও একবার ঝালিয়ে নিলেই চলবে। সবাই মিলে যখন এই 'সময়কে পেছনে ফেলে' পদ্ধতিটি অভ্যাস করবেন তখন ব্যাপারটি এইরকম হবে ঃ

সংলাপ	সময়
একটি দৃশ্যের সমস্ত সংলাপ বলতে সব শিল্পীর প্রথমবার সময় লাগল	২০ মিনিট
দ্রুতগতিতে বলে, সময়কে পেছনে ফেলে, লক্ষ্যসীমা থাকবে	১০ মিনিট

খ) স্তানিশ্লাভস্কি পদ্ধতি

একটি ছোট রবারের বল রিহার্সালে নিয়ে আসুন। যে দৃশ্যটি রিহার্সাল চলছে সেই দৃশ্যের সব অভিনয় শিল্পীরা গোল হয়ে দাঁড়ান। এবার ঐ রবারের বলটিকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে থাকুন ও সঙ্গে সঙ্গে সবাই পরপর নিজের নিজের সংলাপ বলতে থাকুন। কখন কে কাকে বলটি ছুঁড়ে দেবেন আগে থাকতে বলবেন না। কেউ সংলাপ থামাতে পারবেন না। প্রথম প্রথম হাত থেকে বল পড়ে যাবে বা ঠিক মতো ক্যাচ্ লুফতে পারবেন না বা লোফার সময় কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ অভ্যাস করলেই খেলাটি সহজ হয়ে যাবে।

এই মজার খেলার ফাঁকে সংলাপ আত্মস্থ করে ফেলবেন। কারণ, আপনি বল ছোঁড়া ও ধরার দিকে সমস্ত মনোযোগ দিতে বাধ্য হবেন ও মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবচেতনভাবে সংলাপ বেরোতে থাকবে।

২। **রেকর্ডিং পদ্ধতি :**

যদি আপনার কাছে টেপ রেকর্ডার থাকে বা যোগাড় করতে পারেন তবে

ক) প্রথমে নিজের সংলাপ রেকর্ড করে নিয়ে সেটিকে কানের কাছে বারবার বাজিয়ে মাথার মধ্যে বসিয়ে নিন, অবচেতনে ঢুকিয়ে নিন।

খ) এবার আপনার দৃশ্যে আপনার সংলাপগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য অভিনেতাদের সংলাপগুলো রেকর্ডিং করে নিন। এবার টেপটি বাজান ও মন দিয়ে শুনতে থাকুন। যে মুহূর্তে আপনার 'কিউ' আসবে, টেপটি বন্ধ করে দিন ও আপনার সংলাপ বলুন। শেষ হলে আবার টেপ বাজান। এরকমভাবে গোটা দৃশ্যটিই অভ্যাস করুন। সহ অভিনেতাদের কিউগুলোই শুধু রেকর্ড করবেন না, তাদের সমস্ত সংলাপগুলোই রেকর্ড করে নেবেন। 'কিউ' শুনে পার্ট মুখস্থ করার অভ্যাস করলে যখন সহ-অভিনেতার সংলাপের শেষের ৩টি শব্দ শুনতে পাবেন শুধুমাত্র তখনই হঠাৎ একটি ঝাঁকুনি দিয়ে এ্যাকৃশন্ শুরু হয়ে যাবে। অন্যে যখন সংলাপ বলবে তখন তো আপনি বৃষকাষ্ঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, আপনাকেও সংলাপ বলতে হয়—সে সংলাপ অনুচ্চারিত-ভাবে ও প্রকাশে। অপরের সংলাপ যদি আপনার কাছে অজানিত থাকে তবে মঞ্চের উপর আপনার ভূমিকা বৃষকাষ্ঠের মতোই হবে। তাই নিজের পার্ট মুখস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে সহ-অভিনেতাদের পার্ট, কিউ ও এ্যাকৃশন্ সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচিতি থাকা আবশ্যক। তাদের পার্টও পুরো মুখস্থ রাখতে পারলে ভালো হয়। এতে সহ-অভিনেতা পার্ট ভুলে গেলেও আপনি তাকে সাহায্য করতে পারবেন, আগে 'কিউ' ধরে তার বিরক্তিভাজন হবেন না, 'ক্যাচিং' ধরতেও দেরী করবেন না।

৩। **নিমনিক পদ্ধতি :**

আপনার পার্টের মধ্যে একটি সংলাপ বা শব্দ হয়তো দেখবেন কিছুতেই মুখস্থ হতে চাইছে না বা হোঁচট খাচ্ছেন বা ভুলে যাচ্ছেন। এই রকম ক্ষেত্রে ঐ সংলাপ বা শব্দের সাথে মিল আছে এমন কোন ইমেজ বা রূপ চিন্তা করুন—স্মৃতি সহায়ক কোন সংখ্যা, শব্দ বা নাম ব্যবহার করুন, ইংরাজীতে

যাকে বলে 'নিমনিক' (Mnemonic)। সংলাপের চেয়ে এ্যাক্শন্ বেশী আছে, সেইরকম দৃশ্যেও এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকরী। এর জন্য হয়তো আপনাকে যুক্তিতর্ক মানে না এমন কোন শব্দ বা অদ্ভুত কোন সংখ্যা বা আইনকানুন মানে না এমন সব নামের সাহায্য নিতে হতে পারে। তা' হোক, ক্ষতি নেই। কি ভাবে করবেন দেখুন—

সংলাপ

'আমাদের দু'জনের বোঝাপড়ার মধ্যে কারও মধ্যস্থতা চলবে না'—এই সংলাপটিতে 'মধ্যস্থতা' ও 'বোঝাপড়া' শব্দ দু'টি আগে পরে হয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই 'বোঝাপড়া'র স্মৃতি সহায়ক শব্দ হিসেবে 'বোকা' বা 'বোল্ড আউট' শব্দগুলো মনে করা যেতে পারে।

অথবা

'ক্ষুধিত লেলিহান কুক্কুটের মতো'—এখানে 'ক্ষুধিত', 'লেলিহান' 'কুক্কুট', পরপর এই তিনটি শক্ত শব্দের সমাবেশ ঘটায় মুখস্থ হতে দেরী হতে পারে বা গুলিয়ে যেতে পারে। তাই 'ক্ষুধিত'-র জায়গায় 'ক্ষুদিরাম', 'লেলিহান'-এর জায়গায় 'লেনিন' নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪। অসম্পূর্ণ লাইন মুখস্থ করার পদ্ধতি ঃ

কোন অসম্পূর্ণ লাইন মুখস্থ করার সময়, (যেমন, হয়তো এই রকম একটি সংলাপ আছে, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো—' যার পর সহ অভিনেত্রী আপনার বলাকে বাধা দিয়ে 'কিউ' ধরবেন 'আর আসব না',) দু'টি জিনিস মাথায় রাখতে হবে ঃ

ক) প্রথমতঃ, অসম্পূর্ণ শব্দটির পর অর্থাৎ 'হয়তো'র পর লাইনটির সম্ভাব্য সমাপ্তির জন্য আর কয়েকটি শব্দ মনে মনে তৈরী করে রাখবেন যেমন 'হয়তো আর আসবে না' ও রিহার্সালের সময় ব্যবহার করবেন যাতে আপনাকে সহ-অভিনেত্রীর থামিয়ে দেওয়াটি বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাভাবিক মনে হয় ও সত্যি সত্যি মনে হয় একজনের বলাকে আরেকজন বাধা দিল। এতে আরেকটি সুবিধা হবে। আপনার সহ-অভিনেত্রী সময়মতো 'ক্যাচিং' না ধরতে পারলেও আপনি সংলাপটি চালিয়ে যেতে পারবেন —অসহায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

খ) দ্বিতীয়তঃ এই ধরনের অসম্পূর্ণ বা মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত সংলাপগুলোকে ভলিউম, পিচ্ বা সুরের সাহায্যে এমন ভাবে বলতে হবে যাতে সংলাপের প্রথম থেকে শেষের দিকের কথাগুলো জোরালো হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় মঞ্চে ঠিক এর উল্টোটাই অর্থাৎ সংলাপের প্রথম দিকে জোর ও শেষের দিকটুকু খুব আস্তে বলার ঝোঁক থাকে।

বিবিধ :

ক) রাতে আলো নিভিয়ে শোবার আগে যে দৃশ্যটি মুখস্থ করছেন সেটির সমস্ত সংলাপ একাগ্রচিত্তে মনে মনে পড়বেন। ঘুমিয়ে পড়লে অবচেতন মনে সংলাপগুলো আসা-যাওয়া করবে। এতে করে কণ্ঠস্থ সংলাপ আত্মস্থ হয়ে যাবে।

খ) যখন সম্ভব হবে জোরে জোরে গলা ছেড়ে মুখস্থ করবেন। এতে একই সঙ্গে ৩টি ইন্দ্রিয় কাজ করবে।

১) শব্দগুলো দেখবেন,

২) শুনবেন,

৩) অনুভব করবেন। এই তিনটি চেতনাই মুখস্থ করাকে সহজ করে দেবে।

গ) বসে মুখস্থ না করে পায়চারী করে মুখস্থ করাই ভালো। কারণ শরীর সক্রিয় থাকলে মস্তিষ্কও সচেতন থাকে।

ঘ) সংলাপ মুখস্থ করার সময় যদি কোন শব্দ বা একটি গোটা সেনটেন্স কঠিন মনে হয় বা অসুবিধা লাগে তবে পরিচালকের সাথে আলোচনা করে সেই শব্দ বা সেনটেন্সটি পরিবর্তন করুন। কিন্তু কাউকে কিছু না জানিয়ে বা ভাসা-ভাসা বুঝে বা একদম না বুঝে কোন শব্দ বা সেনটেন্স মুখস্থ করবেন না—কারণ ঃ

১) ধরুন, পাণ্ডুলিপির কোন একটি বিশেষ পাতায় চারটি চরিত্রের সংলাপ আছে এবং চারজনই চারটি শব্দের পরিবর্তন করলেন। কোন সংলাপ বলার আগে হয়তো কেউ নির্দ্দিষ্ট ডায়লগের পরিবর্তে

'মানে' কথাটি ব্যবহার করলেন, কেউ হয়তো দু'টি সেনটেন্সকে 'এবং' দিয়ে জুড়ে দিলেন, আবার কেউ কেউ এরকম দু-একটি ছোট ছোট পরিবর্তন করে বসলেন। এর ফলে প্রত্যেকটি পাতায় দশ-পনেরোটি ছোট ছোট অদল-বদল বহু পরিশ্রমে লেখা নাট্যকারের ষ্টাইল বা কাঠামোটির বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। বিশেষতঃ এমন কিছু নাটক আছে, যেমন, ইউরিপিডিসের 'ট্রোজান ওয়ার', সোফোক্লিসের 'কিং ইডিপাস', মার্লোর 'ডঃ ফাউষ্ট', রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি', মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'জনা', ইবসেনের 'গোষ্ট', ইউজিন আয়নেস্কোর 'ষ্ট্রেঞ্জ ইন্টারলুড', ডি, এল, রায়ের 'মেবার পতন', বার্নার্ড শ'র 'আর্মস এ্যাণ্ড দা ম্যান', সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার', ষ্টীনবার্গের 'ফাদার', এ সব নাটকে একটি শব্দও ওলট-পালট করলে বা বদলালে বিপদ আছে। তাছাড়া এটি তো ঠিক যে, যতদূর সম্ভব সংলাপের মৌল অর্থ ঠিক রেখে প্রত্যেক নাট্যকার ও নাটককেই সম্মান দিতে হয়।

২) যদি পাণ্ডুলিপির সংলাপে ডজন খানেক অদল-বদল করেন তা'হলে আপনিই প্রচণ্ড মুস্কিলে পড়বেন। আপনি হয়তো স্বীয় প্রতিভায় অনেক নতুন কথা সংযোজন করলেন আর আপনার সঙ্গে যারা অভিনয় করবেন তাঁরা সেটি জানলো না। ফলে রিহার্সালে 'সংলাপ' বা 'কিউ' সঠিকভাবে বলতে পারবেন না। সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আপনার উপর বিরক্ত হবেন। কারণ, তাঁরা বুঝতেই পারবেন না আপনি কখন ও কিভাবে 'কিউ' ধরবেন বা ছাড়বেন বা আদৌ ধরবেন বা ছাড়বেন কিনা।

৩) একটি একটি করে লাইন বা সেনটেন্স অথবা 'কিউ বাই কিউ' মুখস্থ না করে 'কিউ' শুদ্ধ পুরো দৃশ্যটিই মুখস্থ করবেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ নাটক বা একাঙ্ক নাটকের অংশবিশেষ মুখস্থ না করে একটি সম্পূর্ণ দৃশ্য বা পুরো অঙ্কটিই একসাথে মুখস্থ করবেন। কখনও একটি লাইন বা প্যাসেজ বার বার পড়বেন না, বেশ কয়েকটি পাতা একবারে পড়বেন। এই পদ্ধতিতে সমস্ত দৃশ্যটিতে যে এ্যাকশন্ আছে তাদের

ধারাবাহিকতাকেও আয়ত্ত করতে পারবেন। যদি একটি সেনটেন্স বা কিউ ভুলেও যান, তবে ঘাবড়ে না গিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটির ভেতর দিয়েই চিন্তা করতে পারবেন ও দেখবেন, ঠিক সংলাপটিতেই আবার ফিরে আসতে পারবেন। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি মুখস্থ হয়ে গেলে তার উপর সূক্ষ্ম কাজগুলো করতে পারবেন—যেমন প্রথমে বড় প্যাসেজ, তারপর সেনটেন্স এবং সবশেষে শব্দসমূহ।

চ) শো চলাকালীন যদি কোন সংলাপ ভুলে যান তবে খুব তাড়াতাড়ি Improvise করে বেড়িয়ে যাবেন বা পরবর্তী লাইনে চলে যাবেন। মঞ্চে কোন অবস্থাতেই সহ অভিনেতাকে ফিস্‌ফিস্ করে সংলাপ ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না, কারণ, যাকে বলবেন তিনি তো শুনতে পাবেনই না, উপরন্তু দর্শকরাও ব্যাপারটি ধরে ফেলবেন। নাটক দেখার সময় দর্শকদের কান ও চোখ অসম্ভব ধারালো হয়ে থাকে। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাঁরা ধরে ফেলেন।

বদভ্যাসের দাস হবেন না

ক) মুখস্থ করার সময় সংলাপের আগে এ্যা, ও, উ প্রভৃতি অব্যয়গুলো (এটা অনেকেরই মুদ্রাদোষ) ব্যবহার করবেন না। প্রথমতঃ এই বদভ্যাস সংলাপ বলার স্বাভাবিক মাধুর্যকে নষ্ট করে। দ্বিতীয়তঃ 'ক্যাচিং' বা 'কিউ' ধরতে দেরী হয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ শব্দের মানেটিই পাল্টে যেতে পারে।

খ) কপালে হাত দিয়ে চিন্তা করা, আঙ্গুল কামড়ানো, কপালে আঙ্গুল বা মুঠো দিয়ে টোকা মারা, মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করা, মাথা চুলকানো এর কোনটিই কিন্তু পার্ট মনে হওয়ায় বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনা।

পরিশেষে মনে রাখবেন, পার্ট মুখস্থ হবার পর থেকেই, অর্থাৎ এটি আপনার 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' হবার পর থেকেই রিহার্সালে আগ্রহ বাড়বে, মন বসে যাবে, আনন্দ পাবেন। পার্ট আত্মস্থ হলেই কণ্ঠ ও শরীর আবেগের প্রতি তৎক্ষণাৎ সাড়া দেবে এবং সত্যিকারের ভালো অভিনয় বলতে যা বোঝায় তাই শুরু করবেন।

বিবিধ

বিবিধ

কবিতা-আবৃত্তি অভিনেতার পক্ষে একটি চমৎকার শিক্ষা। বিভিন্ন রীতির পদ্য ও গদ্যপাঠে নমনীয়তা ও অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ে। মন্ত্রপাঠ ও ছন্দোবদ্ধ ঝংকার উচ্চারণের স্পষ্টতা, কাব্যছন্দের রূপ, বিভিন্ন রীতি, জ্ঞান ও বোঝাপড়ার উন্নতি সাধন করে। গীতিকাব্যে সুর ও পরিষ্কার বাচনভঙ্গির প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে গদ্যের বিভিন্ন রীতি বাচনভঙ্গির রীতি-বৈচিত্র্যের উন্নতি সাধন করে।

— চারলস্ ডব্লিউ লোমেস্

নাটকের রীতির সঙ্গে বাচনভঙ্গির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ধ্রুপদী বা রোমান্টিক নাটকের জন্য স্বভাবতই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বাচনভঙ্গির প্রয়োজন। কোনো অভিনেতা হয়তো বিশেষ উচ্চারণে অভ্যস্ত, কারো কথ্যভাষার দিকে ঝোঁক আছে—এঁরা কিন্তু পরিবেশ ও নাটকের মেজাজটিকে নষ্ট করে দিতে পারেন।

— জর্জ কানেল

মনে রাখবেন, যখন আপনার নিজের কথা বলা শেষ হচ্ছে তখন অন্য অভিনেতার বলার পালা। তাঁর কথা বলার আগে আপনি যে সুর ও গতির প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উপর নির্ভর করেই তিনি ধরতাইটি শুরু করবেন।

— জন গিলগুড

অভিনয়কালে মধ্যে মধ্যে অভিনেতাকে দুই-এক ছত্র স্বগত উক্তি করিতে হয়। এমন অনেক নাটক আছে যাহাতে অভিনেতাকে প্রায় দুই পৃষ্ঠা এইরূপ স্বগত উক্তি করিতে হয়। অনেকে বলেন, এইরূপ লম্বা বক্তৃতায় দর্শকবৃন্দের ধৈর্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। বলিতে জানিলে, ভাল করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিলে বোধহয় অর্দ্ধঘন্টা দর্শককে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়। স্বগত উক্তি করিবার সময় এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক দর্শককেই সম্বোধন করিয়া বক্তব্য বলা হইতেছে। সুদূর গ্যালারী হইতে ফ্রন্ট ষ্টল, বক্স ইত্যাদি সকল আসনের দর্শকবৃন্দের প্রতি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে পারিলে সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দ নিশ্চয়ই স্থির হইয়া বক্তৃতা শুনিতে বাধ্য হইবেন।

অনেকের ধারনা 'তোতলার' ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইলে প্রতি কথার আদ্যক্ষর পাঁচ-সাতবার বলিলেই বুঝি তোতলার অভিনয় ঠিক করা হইল। 'তুমি কোথা যাচ্ছ ?' এই কথাটি কেবল 'তু-তু-তু-তু-মি কো-কো-কো-কো-থা-থা-যা-যা-যা-চ্ছ' ?—এইভাবে উচ্চারণ করিলেই ঠিক তোতলা বলিয়া দর্শকের কখনই ভ্রম হইবে না। তোতলার কথা কহিবার বেশ একটু রকম আছে—সেগুলি একজন তোতলার সহিত কথা কহিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ তোতলা ব্যক্তি কথা আরম্ভেই জিব ভিতর দিকে উল্টাইয়া—দুই চারিবার চোখ মটকাইয়া—'উঁকি' তুলিয়া কথা সুরু করেন। তাহার পর গোটা দুই কথা কহিয়া—বার কতক ঢোক্ গিলিয়া—আবার 'উঁকি তুলিয়া' পূর্বোক্তভাবে আরো গোটা পাঁচ-সাত কথা এক নিঃশ্বাসে কহিয়া যান। এইভাবে কথা কহিতে কহিতে মাঝখানে একবার একটা কথা আটক খাইলে, —যেখানে আটক খাইল—সেই পদের অন্তস্থিত 'অ-কার' কিংবা 'আ-কারকে' লইয়া বিষম টানাটানি করিতে আরম্ভ করেন। হয়ত রাগিয়া বলিবেন,—'আমি সেখানে কেন যাব ?' তাড়াতাড়ি ঢোক গিলিতে গিলিতে 'আমি' হইতে 'কেন' অবধি বলিয়া শেষে যা-আ-আ-আ-আ-আ [ব্যাস—এইভাবে চলিতে চলিতে—হঠাৎ ঠোঁট চাপিয়া]—আ-বো—এইটুকু নাকের ভিতর দিয়া নিঃশ্বাসের সহিত মিশাইয়া বাহির করিয়া দিলেন। তেঁতুল খাইতে খাইতে জিবের শব্দ করিয়া লোকে যেমন ঢোক গিলিয়া থাকেন, এর মধ্যে মধ্যে চক্ষু দুইটি মুদিত করিয়া থাকা তোতলামোর একটা প্রধান লক্ষণ।

— ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর একটি ব্যাধি অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে কখনো কখনো পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেটি হইতেছে আবৃত্তির অযথা দীর্ঘসূত্রতা ; ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে এবং অভিনয়টিকে একেবারে মাটি করিয়া দেয়। এ রোগের চিকিৎসা আবশ্যক ; আমার মতে শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্র নিজে ইহার সহজেই প্রতিকার করিতে পারেন। একটু দৌড় কমাইয়া একটু রাশ টানিয়া ধরিলেই এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

— ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ক) অযথা জোরে চিৎকার, যাতে গলায় আঘাত লাগতে পারে, তা সদাসর্বদা বর্জনীয়।

খ) গলায় খুব বেশী ঠাণ্ডা বা গরম লাগান কখনই উচিত নয়।

গ) নিয়মিত লিস্টারিন বা ডেটল অথবা নুন জলের কুলকুচো করা উচিত।

ঘ) স্নানের সময় নাক দিয়ে জল টেনে আবার বার করে ফেলার অভ্যাস থাকা ভালো।

ঙ) এমন কিছু খাওয়া কখনই উচিত নয় যা গলার ক্ষতি করে। বরফ বা রেফ্রিজারেটারের জল পরিহার করাই ভাল।

চ) বিড়ি-সিগারেট গলার পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্ততঃ যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের খুব বেশী পরিমান ধূমপান না করাই উচিত, আর করলেও খুব কম সংখ্যায় এবং দামী সিগারেট খাওয়াই ভাল।

ছ) যাঁদের সর্দিকাশি বা ব্রঙ্কিয়াল ধাত্ আছে, বা ক্রনিক ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে, তাঁদের পক্ষে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিয়ে কখনই স্বর-সাধনা করা উচিত নয়। কেননা তা তাঁদের কণ্ঠ-স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

— ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়

প্রাথমিক মহলা ও কণ্ঠস্বর

সাধারণতঃ ভাড়া করা ছোট ঘরে আমাদের রিহার্সাল দিতে হয়, শিল্পীদের খুব কাছাকাছি কাজ করতে হয়, কণ্ঠস্বরের পরিধিকে বাড়ানো সম্ভব হয় না। অথচ মঞ্চে অভিনয় করার সময় যখন কণ্ঠস্বরকে বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, তখন বাড়তি কণ্ঠস্বরটুকু আনতে গিয়ে স্বরক্ষেপণের বৈচিত্র্য, শুদ্ধ উচ্চারণবিধি ও সংলাপ পরিবেশনের ব্যঞ্জনাটি যায় গুলিয়ে, অভিনীত চরিত্রের ভারসাম্য যায় হারিয়ে। এর ফলে সামগ্রিক প্রযোজনাটি পঙ্গু হয়ে পড়ে। সুতরাং এটি মনে রাখতে হবে যে ঘরে বসে যে প্রাথমিক রিহার্সাল হয় তা কণ্ঠস্বরের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের একটি খসড়া মাত্র—কখনোই চূড়ান্ত নয়। (শুধু মঞ্চের সামনের অংশে অভিনয় করার সময় এই অনুশীলনটি খুব কাজে লাগে)।

মঞ্চের সামনের অংশ থেকে মাঝের অংশে বা শেষের অংশে অভিনয় করার সময় আরো বেশী জোরালো কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন হয়।

তাই মহলাকক্ষে সবরকম পরীক্ষা, ভুলত্রূটি সংশোধন ও ছোটখাট ডিটেলের কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু যখন এগুলো শেষ হয়ে যাবে এবং মোটামুটি নির্ভুল উচ্চারণ, স্বরভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের ব্যাখ্যাক্ষমতাটির ভিত্তি তৈরী হয়ে যাবে, তখন মঞ্চে গিয়ে পূর্ণ মহলা দেবার সময় কণ্ঠস্বরের পরিধিটিকে ক্রমপর্যায়নো-ক্রমিকভাবে বাড়ানোর অনুশীলন করে নিতে হবে। এই সময় দর্শকাসনে কাউকে বসিয়ে কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

বিভিন্ন আকৃতির মঞ্চ ও স্বরপ্রক্ষেপণ

আজকের থিয়েটার শুধুমাত্র প্রসেনিয়ামেই আবদ্ধ থাকছে না। বিভিন্ন আকৃতির মঞ্চে একই নাটকের অভিনয় করতে হচ্ছে; আজ 'মুক্ত-অঙ্গন'-এ কাল 'রবীন্দ্রসদন'-এ, দু'দিন পর নৈহাটির ম্যারাপ বাঁধা প্রতিযোগিতা-মঞ্চে, আবার হয়তো বাঁকুড়ার কোন কৃষকের উঠোনে বা মেদিনীপুরের হাউর গ্রামের কোন হাটের মাঝে। সব প্রসেনিয়াম থিয়েটারেরও শব্দগ্রহণ ক্ষমতা এক নয়। 'শিশির মঞ্চ'-র সঙ্গে 'বিদ্যামন্দির'-এর শব্দধারণ ক্ষমতার তুলনা চলে না,

'কলামন্দির' বা 'একাডেমী' অথবা 'যোগেশ মাইম একাডেমী' বা 'বিজন থিয়েটার'-এর সিলিংয়ের উচ্চতা, আসন সংখ্যা ও নির্মান-কৌশলের জন্য এই শব্দধারণ ক্ষমতার তারতম্য আছে। এক্ষেত্রে যে মঞ্চে নাটকটি অভিনীত হবে, বোর্ড রিহার্সালের সময় অথবা অভিনয়ের বেশ কিছু সময় আগে নিজের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঐ বিশেষ প্রেক্ষাগৃহটির শব্দধারণ ক্ষমতার একটি সমতা আনার চেষ্টা করতে হবে। এটি না করতে পারলে কণ্ঠস্বরের একই ব্যাপ্তি নিয়ে কোন প্রেক্ষাগৃহে হয় 'লাউডার' থাবেন, নয়তো রসজ্ঞ দর্শক মনে করবেন আপনি খামোকা চিৎকার করছেন বা অত উঁচুতে গলা না তুললেও চলত।

মাইক-প্লে

বর্তমানে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী মঞ্চে, বিশেষতঃ যাত্রা পালায় বা আমন্ত্রিত অভিনয়ে অথবা যে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের শব্দগ্রহণ ক্ষমতা খুবই ত্রুটিপূর্ণ—এইসব ক্ষেত্রে মাইকের সাহায্যে সংলাপ শোনানোর রীতি চালু হয়েছে। এর কয়েকটি কুফল রয়েছে। যেমন,

১) ঝুলন্ত খান দশেক 'সিওর মাইকের' অবস্থান নাটকের দৃশ্যগত মেজাজ ও রূপমাধুর্যকে বার বার ধাক্কা মারে।

২) অতিমাত্রায় যান্ত্রিক সচেতনতার ফলে সংলাপের কাব্যিক ও শৈল্পিক রসগ্রহণে বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়।

৩) এই যন্ত্রটি কখন কি রকম ব্যবহার করবে, তা একমাত্র তিনি বা তার নিয়ন্ত্রক বলতে পারেন, প্রায় সমস্ত প্রযোজনাটাই তার কার্যক্ষমতার উপর অসম্ভব রকম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৪) ক্রমাগত মাইকে অভিনয় করার ফলে অভিনেতার কণ্ঠস্বর চর্চার তাগিদটি ধীরে ধীরে কমে যেতে বাধ্য এবং তখন যদি কোথাও মাইক ছাড়া অভিনয় করতে হয়, তবে খুবই অসুবিধায় পড়তে হতে পারে।

৫) সর্বক্ষণ মাইকের সামনে অভিনয় করার জন্য সংলাপের অর্থ প্রকাশের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি ও চলাফেরার যৌক্তিকতা ও সাযুজ্য পদে পদে জটিলতার সৃষ্টি করে চলে।

৬) অভিনয় শুরু হবার মাত্র দু'-এক ঘন্টা আগে মাইক টাঙ্গানো হয় ; বিশেষ এই মাধ্যমটির সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সমন্বয় সাধনের ন্যূনতম সময়টুকুও পাওয়া যায় না।

৭) অভিনয় চলার সময় ঝুলন্ত বা দাঁড় করানো ঐ যন্ত্রগুলোর পাঁচটির মধ্যে দু'টিই কোন কাজ করে না, তখন আর কিছু করারও থাকে না।

৮) চারপাশে ছড়ান বৈদ্যুতিক তারে পা বেঁধে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

৯) মঞ্চের ভেতরে বা উইংসের কাছাকাছি কোন জায়গায় হঠাৎ কোন জিনিস পড়ে গেলে বা জরুরী কোন নির্দেশ কাউকে দিলে সরাসরি তা দর্শকের কানে গিয়ে আঘাত করে, তাঁদের মনোযোগ নষ্ট করে দেয়।

১০) মঞ্চের যেখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন রিহার্সাল দেয়া হয়েছে বা সম্মিলিত একটি সুন্দর ছবি তৈরী করা হয়েছে, বিনা প্রস্তুতিতেই হয়ত কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত প্যাটার্নটিকে পাল্টে ফেলতে হয়।

১১) যিনি শব্দক্ষেপণে আবহসঙ্গীতের ভার নিয়েছেন তাকে যে কতবার স্যুইচ্ 'অফ' আর 'অন' করতে হয় তার হিসেব কে রাখে।

১২) আর এতসব মানসিক চাপ নিয়ে কি অভিনয় হয়, না একটি সুন্দর প্রযোজনা আশা করা যায় ?

তাই যেখানে মাইক ছাড়া নাটক প্রযোজনা একেবারেই অসম্ভব, সেখানে খুব সতর্ক ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে যথেষ্ট মহলা না দিয়ে অভিনয় করা ঠিক নয়।

আবহসঙ্গীত ও কণ্ঠস্বর

আবহসঙ্গীতের এফেক্টের সাথে সমতা রেখে কণ্ঠস্বরের অনুশীলনও বিশেষ প্রয়োজন। মাইকের সাহায্যে বাজান হলে তার শব্দপ্রয়োগের ব্যাপ্তি কণ্ঠস্বরের চেয়ে অন্ততঃ ১০ গুণ বেশী হয়। এফেক্টের উপরে, কমপক্ষে সমপরিমাণ ব্যাপ্তিটুকু কণ্ঠস্বরে সংলাপ বলার সময় থাকতেই হবে। না হলে সংলাপ শোনা যাবে না। যিনি টেপ রেকর্ডার চালাবেন বা বাজনা বাজাবেন তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট বোঝাপড়া থাকা দরকার, না হলে বিপত্তি অনিবার্য।

যদি টেপ বাজান হয় তাহলে কোন্ দৃশ্যে তা কত ভলিউম-এ যেমন (১, ২ বা ৩ নম্বর) রাখতে হবে সেটি যেমন শব্দ নিয়ন্ত্রকের জানা দরকার তেমনি

অভিনেতারও বুঝে নেয়া দরকার কোন এফেক্টের পরেই যদি সংলাপ বলতে হয় তবে সেই শব্দ যে ব্যাপ্তি দর্শকের কানে গেঁথে দিয়েছে, যে শব্দের অনুরণন ও উচ্চতার সঙ্গে দর্শক সেই মুহূর্তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তার উপরে গলার স্বরকে প্রক্ষেপ করতে হবে। পরে ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক স্কেলে আনতে হবে।

সমবেত কণ্ঠের ভারসাম্যতা

সতীর্থ অভিনয়শিল্পীদের কণ্ঠস্বরের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের সঙ্গে সমতা রেখে সংলাপ প্রক্ষেপণের কৌশলটিও আয়ত্বে থাকা চাই। সহ-অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে ভলিউম-এ সংলাপ বলছেন, যদি বিরতি না দিয়ে তাঁর সংলাপ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ বলতে হয়, তাঁর কণ্ঠস্বরের সমান ব্যাপ্তিটি অনুসরণ করতে হবে, নয়ত তার উপর আরো একমাত্রা কণ্ঠস্বরকে নিয়ে যেতে হবে। নাহলে সংলাপ চাপা পড়ে যাবে ও সামগ্রিক শব্দ-প্রবাহের সমতা থাকবে না। অবশ্য এই কৌশলটি অনেকদিনের মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই আয়ত্ত করা সম্ভব।

স্বরের বৈচিত্র্য

সাধারণতঃ দেখা যায় পর্দা উঠবার পর একজন বা দু'জন অভিনয়শিল্পী যে যে স্বরগ্রামে ও সুরে সংলাপ বলছেন, এর পর সেই দৃশ্যে যাঁরাই প্রবেশ করেন তাঁরা ঐ পূর্বোক্ত অভিনেতাদের সংলাপ বলার সুরকেই অনুসরণ করেন। ফলে সমস্ত দৃশ্যটি একঘেয়ে ও নীরস হয়ে পড়ে। এই মারাত্মক ভুলটি করবেন না। যখনই কোন দৃশ্যে প্রবেশ করবেন, সব সময় চেষ্টা করবেন যাতে যে স্বরগ্রামে বা সুরে অন্যান্য শিল্পীরা অভিনয় করছেন তা যেন নিজের কণ্ঠস্বরেও হুবহু প্রতিফলিত না হয়—অন্ততঃ ছন্দটুকুতে যেন স্বাতন্ত্র্য থাকে।

স্বাস্থ্য ও কণ্ঠস্বর

শারীরিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম বশেই সমস্ত শব্দের উদ্ভব।

শব্দের যে যন্ত্রটি আছে তা মানুষের শরীরেরই একটি অংশ, অতএব এটি শরীরবিদ্যা নিয়মের মধ্যেই পড়ে।

শরীর ও শারীরবিদ্যা—এই দুটি পদ্ধতি মানুষের কণ্ঠস্বরের সংগে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে প্রত্যেক অভিনেতারই শরীর সম্পূর্ণভাবে সুস্থ রাখা উচিত। সুস্থ শরীরই একমাত্র সতেজ ও সুন্দর কণ্ঠস্বরের প্রযোজক। অতিরিক্ত শারীরিক উত্তেজনা কণ্ঠস্বরকে কর্কশ এবং অস্বাভাবিক করে তোলে। শারীরিক স্থূলতা এবং অতিরিক্ত আরামপ্রিয়তা কণ্ঠস্বরকে ক্ষীণ ও ও দুর্বল করে তোলে।

ধোঁয়াটে পরিবেশে ও অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করলে বা কাজ করলে গলা খারাপ হতে বাধ্য। বয়স যত বাড়তে থাকবে অভিনেতার গলার প্রতি তত বেশী যত্ন নেওয়া দরকার।

এ্যালকোহল ও অতিরিক্ত ধূমপান কণ্ঠস্বরের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক, কিন্তু এই দু'টি জিনিসের মিতাচার ক্ষতিকারক নয়। নিজের চেহারা সম্বন্ধে যতখানি যত্নবান, কণ্ঠস্বর সম্বন্ধেও ততখানি যত্নবান হলেই চলবে।